বঙ্গ
কমলবার্তা
জুলাই সংখ্যা। ২০২৪

বাজেটে বাংলাকে দেওয়া কথা রাখলেন মোদী

বাংলাদেশের সংরক্ষণবিরোধী আন্দোলন
ভারতের ভূমিকা

সরকারি কর্মীদের
আরএসএস করতে রইল না বাধা

কেন্দ্রীয় বাজেট ২০২৪:
নতুন ভারত নির্মাণের মাইলস্টোন

পশ্চিমবঙ্গের 'ভোট-যুদ্ধ

কেন্দ্রীয় বাজেট নিয়ে তৃণমূলের মিথ্যাচার
কথা রাখলেন নরেন্দ্র মোদী

ফিরহাদ হাকিমের বিষাক্ত মন্তব্য

উপনির্বাচন!
নাকি প্রহসন!

একজন আদর্শ শিক্ষাবিদ:
ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

মস্কোয় মুখোমুখি দুই বন্ধু – ভারতের প্রধানমন্ত্রী এবং রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি

রাশিয়ার পরমাণু কেন্দ্রে ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

বৈঠকে ভারত – রাশিয়া।

মস্কোয় প্রবাসী ভারতীয়দের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

অস্ট্রিয়ার ভিয়েনায় নরেন্দ্র মোদীকে গার্ড অব অনার সম্মান, সঙ্গে অস্ট্রিয়ার চ্যান্সেলর কার্ল নেহামার।

বৈঠকে ভারত – অস্ট্রিয়া। মুখোমুখি দুই রাষ্ট্রপ্রধান। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং অস্ট্রিয়ার প্রেসিডেন্ট আলেকজান্ডার ভ্যান ডার বেল।

বঙ্গ
কমলবার্তা
জুলাই সংখ্যা। ২০২৪

কেন্দ্রীয় বাজেট নিয়ে তৃণমূলের মিথ্যাচার ৪
অমিতাভ চক্রবর্তী

উপনির্বাচন! নাকি প্রহসন! ৬
অভিরূপ ঘোষ

ফিরহাদ হাকিমের বিষাক্ত মন্তব্য ৯
সৌভিক দত্ত

পশ্চিমবঙ্গের 'ভোট-যুদ্ধ ১১
নারায়ণ চক্রবর্তী

ছবিতে খবর ১৬

একজন আদর্শ শিক্ষাবিদ: ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ২২
অয়ন বন্দ্যোপাধ্যায়

সরকারি কর্মীদের আরএসএস করতে রইল না বাধা ২৫
শুভ্র চট্টোপাধ্যায়

কেন্দ্রীয় বাজেট ২০২৪ ২৭
দিব্যেন্দু দালাল

বাংলাদেশের সংরক্ষণবিরোধী আন্দোলন ও ভারত ৩০
বিনয়ভূষণ দাশ

ফেক নিউজ ৩৩

সম্পাদক: জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়
কার্যনির্বাহী সম্পাদক : অয়ন বন্দ্যোপাধ্যায়
সহযোগী সম্পাদক : জয়ন্ত গুহ
সম্পাদকমন্ডলী:
অভিরূপ ঘোষ, কৌশিক কর্মকার, সৌভিক দত্ত, অনিকেত মহাপাত্র
সার্কুলেশন: সঞ্জয় শর্মা

সম্পাদকীয়

জনাব ফিরহাদ হাকিম কি বাংলার সম্পদ না আপদ – তাহা আমাদের জানা নাই। কিন্তু একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় তিনি কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র পদের যোগ্য নন। কলকাতার মহানাগরিক তো হিন্দু-মুসলমান সবার, তাহলে তিনি কিভাবে বলেন, "যারা ইসলাম নিয়ে জন্মায়নি তারা দুর্ভাগা। যারা দুর্ভাগ্য নিয়ে জন্মেছে, যারা ইসলাম নিয়ে জন্মায়নি, তাদের দাওয়াত - এ - ইসলাম অর্থাৎ ইসলামে দাওয়াত দিয়ে ইসলামে নিয়ে আসতে হবে!!" সোজাকথায় তিনি পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু-বাঙালীকে ধর্মান্তরিত করার জন্য উসকানি দিচ্ছেন। কি বলে অভিহিত করব, জনাব ফিরহাদের এই গেঁয়ো (গ্রামীন নয়) শব্দচয়নকে? প্রগলভতা নাকি বাঁচালতা? বেঁচে থাকলে, সংস্কৃত-সাংখ্য ও বেদান্তে পণ্ডিত এবং বিধুশেখর শাস্ত্রীর ছাত্র সৈয়দ মুজতবা আলী হয়ত বলতেন – এই অহেতুক ভ্যাচর ভ্যাচর কেন বরদাস্ত করবে বাঙালী? এই খেয়েচে। এইখানেই তো বড় প্রশ্ন। জনাব ফিরহাদ কি আদৌ বাঙালী?

জনাব ফিরহাদ হাকিমই পশ্চিমবাংলার সেই রাজনীতিক যিনি শুধু ধর্ম নয় ভাষার ভিত্তিতেও পশ্চিমবঙ্গের বিভাজন চেয়েছিলেন। তিনিই তো বলেছিলেন, "আমার পূর্বপুরুষরা বিহার থেকে বাড়িতে (পশ্চিমবঙ্গে) এসে উর্দুতে কথা বলত …… ইনশাল্লাহ, বাংলায় এমন একটি দিন আসবে যখন অর্ধেক জনসংখ্যা উর্দুতে কথা বলবে"। এমন খোয়াবনামা সর্বসমক্ষে বলার আগে বাংলা ও বাঙালীর রাজনৈতিক ইতিহাস নিয়ে এক্কেবারেই বালকবুদ্ধি ফিরহাদ মিয়াঁর সম্ভবত জানা ছিলনা, বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের অন্যতম কারণ ছিল তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানে জোর করে চাপিয়ে দেওয়া উর্দু ভাষা। উর্দু, ঘোষিত ইসলামিক দেশ পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা। কলকাতার মহানাগরিক হওয়া তো অনেক দূরের কথা, তিনি কি একজন বাঙালী রাজনীতিক হওয়ার যোগ্য? তিনি কি আদৌ বাংলা ভাষা নিয়ে গর্বিত একজন বাঙালী হওয়ার যোগ্য? যে কলকাতায় দাঁড়িয়ে তিনি মহানাগরিক হয়ে, হিন্দু-বাঙালীকে ধর্মান্তরিত করার স্বপ্ন দেখছেন এবং বাংলা-বাঙালীর মাতৃভাষা কেড়ে নিয়ে স্বৈরাচারী পাকিস্তানের মত উর্দু ভাষাকে চাপিয়ে দিতে চাইছেন সেই শহরেই ১৯৩৭ সালে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে তৎকালীন উপাচার্য শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের অনুরোধে সব ব্রিটিশ রীতিনীতি ভেঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অভিভাষণ পাঠ করেছিলেন বাংলা ভাষায়। সেই বাংলা ভাষাকে আক্রমণ করেছেন ফিরহাদ। বাংলা-বাঙালী-বাংলার হিন্দু এবং কলকাতা কর্পোরেশনের সম্মানীয় মেয়রের চেয়ারকে যেভাবে অসম্মান করেছেন ফিরহাদ সেটা রাজাকারদের বংশধররাও কল্পনায় আনতে পারেনা। প্রায়শ্চিত্ত করতে এই মুহূর্তে পদত্যাগ করা উচিৎ ফিরহাদ হাকিমের। অন্যথায় তাকে মেয়র পদ থেকে বরখাস্ত করা উচিৎ তার দলের। তিনি যে এখনও মহানাগরিকের চেয়ারে বসে আছেন সেটা চিত্তরঞ্জন-নেতাজির অপমান। রবীন্দ্রনাথের অপমান। বাংলা ভাষার অপমান। বাংলা ও বাঙালীর অপমান। বাংলায় বসবাস করা প্রতিটি বাঙালী হিন্দুর অপমান।

কেন্দ্রীয় বাজেট নিয়ে তৃণমূলের মিথ্যাচার
কথা রাখলেন নরেন্দ্র মোদী

অমিতাভ চক্রবর্তী

বাংলাকে উন্নয়নের গ্যারান্টি দিয়েছিলেন, বাজেটে সেই কথা রাখলেন নরেন্দ্র মোদী কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেসের তরফ থেকে মিথ্যাচার করা হচ্ছে যে কেন্দ্রীয় বাজেটে পশ্চিমবঙ্গের জনগণের কল্যাণের কথা ভাবা হয়নি। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের এই বাজেটে প্রতিফলন ঘটেছে বিজেপির নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি 'মোদি কী গ্যারান্টি ও বিকশিত ভারত গঠনের সংকল্প'-এর, যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে আমাদের পশ্চিমবঙ্গও।

২০২৪-এর কেন্দ্রীয় বাজেটে একাধিক ঘোষণায় গুরুত্বপূর্ণ জায়গা পেয়েছে পশ্চিমবঙ্গ কিন্তু তৃণমূলের তারস্বরে চিৎকার – বাংলা কিছুই পায় নাই, কিছুই পায় নাই। এই ডাহা মিথ্যা কথা তৃণমূলের কালচার। ভবিষ্যৎ অন্ধকার, বিপুল ভাবে কমতে থাকা জনসমর্থন এবং রাজ্যের অর্থনীতিতে ভাঁড়ে মা ভবানী হওয়ায় তৃণমূলের মিথ্যা ছড়ানো ছাড়া গতি নেই। বাজেট নিয়ে তৃণমূলের হাহুতাশের বড় কারণ আসলে বড়ই বেদনার। এই বাজেট থেকে আসলে 'পশ্চিমবঙ্গের হাঙ্গরবাহিনী' কিছুই গিলতে পারবে না কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং পশ্চিমবঙ্গ 'কিছুই পায় নাই' – এটা একেবারেই কল্পনাপ্রসূত একটি রম্যরচনা। এবার দেখে নেওয়া যাক এবারের বাজেটে পশ্চিমবঙ্গ কি কি পেল।

পূর্বোদয় যোজনা

এই যোজনার মাধ্যমে দেশের পূর্ব প্রান্তের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। যোজনার অন্তর্গত রাজ্যগুলি হল- পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা, বিহার, ঝাড়খণ্ড ও অন্ধ্রপ্রদেশ। এই রাজ্যগুলির মানবসম্পদ, পরিকাঠামো, অর্থনীতি- এই সমস্ত কিছুরই উন্নয়নের লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে, পূর্বোদয় যোজনার মাধ্যমে। যেখানে পশ্চিমবঙ্গ হতে চলেছে একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র যা দেশের সার্বিক উন্নয়নে বড় ভূমিকা নেবে।

পরিকাঠামো

অমৃতসর-কলকাতা শিল্প করিডরের মধ্যে গয়াতে একটি শিল্পকেন্দ্র গঠনে উদ্যোগী হয়েছে কেন্দ্র সরকার। গয়া পার্শ্ববর্তী রাজ্য বিহারে অবস্থিত, তাই এখানে গুরুত্বপূর্ণ শিল্পকেন্দ্র স্থাপন হলে গোটা পূর্বাঞ্চলেই তার প্রভাব পড়বে যার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গও রয়েছে।

শিল্প

মৎস্য চাষ পশ্চিমবঙ্গের একটি বড় অংশের মানুষের প্রধান জীবিকা। কেন্দ্রীয় সরকার চিংড়ি উৎপাদনের জন্য আর্থিক

বরাদ্দের ঘোষণা করেছে। গড়ে তোলা হবে চিংড়ি প্রজনন কেন্দ্র এবং নাবার্ডের (NABARD) মাধ্যমে তা রফতানি করা হবে। এর ফলে বিশেষভাবে উপকৃত হবেন পশ্চিমবঙ্গের মৎস্যজীবীরা। বিশেষত দক্ষিণবঙ্গের অন্তর্গত দক্ষিণ ২৪ পরগনা ও দুই মেদিনীপুরের মানুষজন।

গ্রামোন্নয়ন

'প্রধানমন্ত্রী জনজাতি উন্নত গ্রাম অভিযান'- এর লক্ষ্য হল ৬৩ হাজার আদিবাসী গ্রামের ৫ কোটি জনজাতি পরিবারের কাছে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা ও কেন্দ্রীয় সরকারের উন্নয়নকে পৌঁছে দেওয়া। কেন্দ্রীয় সরকারের এই প্রকল্পের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গের রাঢ়বঙ্গ, উত্তরবঙ্গ সমেত জঙ্গল মহলের আদিবাসী সমাজের মানুষজন বিশেষ উপকৃত হবে।

কেন্দ্রীয় বাজেটে ইতিমধ্যেই গ্রামোন্নয়নের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে ২ লাখ ৬৬ হাজার কোটি টাকা। এর ফলে পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ অঞ্চলগুলি বিশেষভাবে উপকৃত হবে।

শক্তি ও শহর বিকাশ

'প্রধানমন্ত্রী সূর্য ঘর মুফত বিজলি যোজনা'-এর মাধ্যমে বাড়ির ছাদে সোলার প্ল্যান্ট বসিয়ে বিনামূল্যে ৩০০ ইউনিট পর্যন্ত বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যাবে। ১ কোটি বাড়ির ছাদে এই প্রকল্প চালুর পরিকল্পনা নিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দারা নিজেদের বাড়ির ছাদে সোলার প্ল্যান্ট বসিয়ে এই সুবিধা পেতে পারেন।

শহুরে হাউজিং

'প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা'তে মোদী সরকার ১০ লাখ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। এর ফলে পশ্চিমবঙ্গের শহরাঞ্চলে বসবাসকারী গরিব এবং নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষজন উপকৃত হবেন। তাঁদের বাড়ি তৈরি করে দেবে সরকার। কলকাতা অঞ্চল, আসানসোল-দুর্গাপুর অঞ্চল, শিলিগুড়ি অঞ্চলের মানুষজন এই প্রকল্পের সুবিধা নিতে পারবেন।

রাজনৈতিক মোকাবিলা

বিজেপি তৃণমূলের থেকে সম্পূর্ণভাবে আলাদা। বিজেপি কখনও বাজেটকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ভাবেনা। কিন্তু তৃণমূলের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে তাদের বাজেটে মানুষের মৌলিক চাহিদা, স্বাস্থ্য-শিক্ষা-কর্মসংস্থানকে অগ্রাহ্য এবং অবজ্ঞা করে, সর্বদাই একটি নির্দিষ্ট সম্প্রদায়কে সন্তুষ্ট করার প্রবণতা থাকে।

'প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা' প্রকল্পে যে নতুন বরাদ্দ কেন্দ্র করেছে, এতে সামগ্রিকভাবে উপকৃত হবেন পশ্চিমবঙ্গের মানুষজন, এটা অবশ্য তখনই সম্ভব হবে যদি তৃণমূল কংগ্রেস দুর্নীতি থেকে বিরত থাকে। কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেট অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গের যুবক-যুবতীরাও Employment Linked Incentive Scheme-এর প্রকল্প থেকে উপকৃত হবেন। এটা উল্লেখ করা প্রয়োজন তৃণমূল কংগ্রেস পশ্চিমবঙ্গের বেকারত্ব কমাতে পারেনি। 'পূর্বোদয় যোজনা'র লক্ষ্যই হল পশ্চিমবঙ্গে একাধিক মাধ্যমে উন্নয়নের জোয়ার নিয়ে আসা। কলকাতা-অমৃতসর শিল্প করিডরের যে ভাবনা, এর মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতি এবং কর্মসংস্থানের ব্যাপক উন্নয়ন হবে। বিজেপি সর্বদাই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ দেশের পরিকাঠামো, অর্থনীতি ও কর্মসংস্থানের উন্নয়নের জন্য।

চিংড়ির উৎপাদন ও রফতানির পাশাপাশি 'প্রধানমন্ত্রী জনজাতি উন্নত গ্রাম অভিযান' অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে পশ্চিমবঙ্গের উপকূল অঞ্চল সমেত রাঢ়বঙ্গের খনি অঞ্চলের মানুষজনের জন্য।

মোদি সরকার আগে বাংলার জন্য যে বরাদ্দগুলি করেছিল তার প্রায় পুরোটাই অপব্যবহার করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। ১০০ দিনের কাজে ও 'প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা'য় তৃণমূলের ব্যাপক দুর্নীতির প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। কেন্দ্রীয় প্রকল্পের টাকা নিয়ে তৃণমূল দান-খয়রাতির রাজনীতিও করেছে। স্থানীয় তৃণমূল নেতারা কেন্দ্রীয় প্রকল্পের টাকা হয় বিপুলভাবে আত্মসাৎ করেছেন অথবা তা অব্যবহৃত হয়ে পড়ে রয়েছে।

মুখে তৃণমূল দাবি করে যে তারা জনকল্যাণমূলক দল, কিন্তু বিগত পঞ্চায়েত ও লোকসভা নির্বাচনের পরে তাদের এই দাবি মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। কারণ যে সমস্ত অঞ্চলে তৃণমূল কংগ্রেস বিজেপির কাছে পিছিয়ে পড়েছে, সেখানে তারা রাজ্য সরকারের প্রকল্পগুলিকে বন্ধ করে দিয়েছে। ভগবানগোলার জনৈক তৃণমূল নেতা হোসেন প্রকাশ্যেই হুমকি দিয়েছেন, বিরোধীরা যে পঞ্চায়েতে জিতেছে সেগুলিকে যেন কোনও রকমের সাহায্য না করা হয়। তৃণমূলের এই স্বৈরাচারী ও প্রতিহিংসামূলক রাজনীতির শিকার আজ সাধারণ মানুষ।

উপনির্বাচন! নাকি প্রহসন!

অভিরূপ ঘোষ

প্রহসনের উপনির্বাচনে এবার 'রাণাঘাট দক্ষিণে ৭০ হাজার, বাগদায় ২০ হাজার এবং রায়গঞ্জে ৫০ হাজার ভোটারকে ভোট দিতে দেয়নি তৃণমূল। মাণিকতলায় ৮টি ওয়ার্ডে লুট করেছে তৃণমূল। সেই সঙ্গে বেছে বেছে হিন্দুদের ভোট দিতে দেয়নি," দাবি করেছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

একটা অস্থির সময়ের মধ্যে দিয়ে চলছে রাজ্য। গণতন্ত্রের সবথেকে বড় উৎসব অর্থাৎ নির্বাচন প্রহসনে পরিণত হয়েছিল অনেকদিন আগেই। যত দিন যাচ্ছে ভোট বিষয়টা ততটাই যেন প্রায় ছেলেখেলার মত একটা বস্তুতে পরিণত হচ্ছে। পঞ্চায়েত নির্বাচন তো প্রায় হয়ই না। কেন্দ্রীয় বাহিনী দিলে লোকসভা এবং বিধানসভা নির্বাচন যদিও কিছুটা হত, তৃণমূল আসার পর সেটাও দিনে দিনে পুতুল খেলা হয়ে যাচ্ছে। স্থানীয় স্তরে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়ন এবং তাদের গাইড করার দায়িত্ব রাজ্য সরকার তথা রাজ্য পুলিশের। নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন সরকার কেন্দ্রীয় বাহিনী পাঠাচ্ছে ঠিকই কিন্তু তাদেরকে হয় বসিয়ে রাখা হচ্ছে নয়তো কম গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে। 'খেলা খেলছে' রাজ্য সরকারের কিছু আধিকারিক এবং পুলিশ। ফলে একটা বড় অংশে যথেচ্ছভাবে ভোট লুট এবং সন্ত্রাস চালাতে পারছে তৃণমূলের গুন্ডাবাহিনী। ফলত ছাপ্পা, রিগিং, ভোটলুট আর সন্ত্রাসের খেলা পঞ্চায়েত নির্বাচনের মতো বিধানসভা এবং লোকসভা নির্বাচনেও শুরু হয়ে গেছে। সাথে যোগ হয়েছে তৃণমূলের নতুন টেকনিক ইভিএম লুট এবং কাউন্টিং সেন্টার ম্যানেজমেন্ট। যেখানে ভোটলুট আর সন্ত্রাস করেও জেতা যাচ্ছে না সেখানে কাউন্টিং সেন্টারে রাজ্য সরকারী আধিকারিকদের সহায়তায় ভোটের ফলাফলটাই বদলে দিচ্ছে তৃণমূল।

হ্যাঁ এর সবটা মিডিয়ায় দেখা যায় না। প্রথমত স্ট্রংরুম বা কাউন্টিং সেন্টারের মত অনেক জায়গায় মিডিয়ার প্রবেশ নিষিদ্ধ। দ্বিতীয়তঃ সব জায়গায় মিডিয়ার ক্যামেরা পৌঁছে যাবে এটা বাস্তবে কোনদিনই সম্ভব নয়। তৃতীয়তঃ ভয় এবং লোভের দ্বারা বাংলা মিডিয়ার একটা বড় অংশকে তৃণমূল প্রশাসনের মতই নিজেদের দলদাসে পরিণত করে নিয়েছে। এতকিছুর পরেও সন্ত্রাসের যে ছবি এ রাজ্যে দেখা যায় তার ছিটেফোঁটাও দেশের অন্য কোন রাজ্যের নির্বাচনে দেখা যায় না। অবশ্য তৃণমূলের সন্ত্রাসকে বুঝতে গেলে শুধু মিডিয়ার খবরের আশায় বসে থাকতে হবে এমনটা নয়। ন্যূনতম বুদ্ধিসম্পন্ন যে কোনো নিরপেক্ষ নাগরিক ভোটের ফলাফলে চোখ বোলালেই পরিষ্কার হয়ে যাবে কি পাহাড়প্রমাণ অরাজকতা চলছে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে।

লোকসভা ভোটের নিরিখে বাগদায় বিজেপি পেয়েছিল এক লক্ষ বারো হাজার সাতশ চারটি ভোট। অন্যদিকে তৃণমূলের

জুটেছিল বিরানব্বই হাজার মতো। মাত্র দু'মাসের ব্যবধানে ফলাফল পুরো উল্টে দিয়েছে তৃণমূল। এখানে কুড়ি হাজার ভোটে হারা আসন ৩৩ হাজার ভোটে দখল করেছে মমতা ব্যানার্জীর হার্মাদ বাহিনী। রাজ্যের এক প্রথম সারির নিউজ পোর্টাল জানাচ্ছে বাগদা কেন্দ্রের ২৩৩, ২৩৫, ২৪০, ২৭৮ নম্বর বুথে ভোট লুট হয়েছে বলে ভোটের দিনেই দাবি করেছিল বিজেপি। এই বুথগুলির সবকটিতেই বিজেপি যথেষ্ট শক্তিশালী। তারপরেও রেজাল্ট বেরোনোর পর দেখা যাচ্ছে ২৩৫ নম্বর বুথে তৃণমূল প্রার্থী মধুপর্ণা ঠাকুর পেয়েছেন ৮৪৪ ভোট। ফরওয়ার্ড ব্লকের গৌর বিশ্বাস ৩০ এবং বিজেপির বিনয় বিশ্বাস ১০। সম্ভব! একইভাবে ওই নিউজ পোর্টালের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী ২৩৩ নম্বর বুথে তৃণমূল ৬৭৮, ফরওয়ার্ড ব্লক ৪৭ এবং বিজেপি ৫৫। আবার ২৪০ নম্বর বুথে তৃণমূল ২৮১, ফরওয়ার্ড ব্লকের ২ এবং বিজেপি ৩৪। এলাকার বিজেপি সমর্থকদের দাবি তারা নিজেদের ভোট কেউ দিতেই পারেনি। সে ক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠছে তাহলে ভোট শতাংশ এত বেশি হল কি করে! উত্তর সহজ। সরকারি মদতে বিনা বাধায় ছাপ্পা মেরেছে তৃণমূল, তাই এই ফলাফল।

একই অবস্থার রায়গঞ্জ বিধানসভাতেও। লোকসভা ভোটের নিরিখে তৃণমূল প্রার্থী কৃষ্ণ কল্যানী পেয়েছিলেন ৪৬ হাজার ভোট। বিজেপি প্রার্থী পেয়েছিল ৯৩ হাজার মানুষের আশীর্বাদ। কিন্তু দুমাস পর বিধানসভা ভোটে দেখা গেল ছাপ্পা এবং সন্ত্রাস করে পুরো ফলাফল উল্টে দিয়েছে তৃণমূল। লোকসভা ভোটে হেরে যাওয়া তৃণমূল প্রার্থী এবার পেয়ে গেল ৮৬ হাজার ভোট! আর বিজেপির ভোট কমে হয়ে গেল ৩৬ হাজার! ভোট লুট না হলে এই ফল যে কোনভাবেই সম্ভব নয় তা সহজেই অনুমেয়।

অন্যদিকে লোকসভায় রানাঘাট দক্ষিণে বিজেপি পেয়েছিল প্রায় ৫২ শতাংশ ভোট। মাসখানেক পরে উপনির্বাচনের রেজাল্টে দেখা যাচ্ছে সেটা নামিয়ে আনা হয়েছে ৩৬ পার্সেন্টে। হ্যাঁ নামিয়ে আনা হয়েছে, নিজে থেকে নামে নি। কারণ দু'মাসের মধ্যে নির্বাচনে কোনো রাজনৈতিক দলের ১৬% ভোট কমে যাওয়াটা প্রায় অসম্ভব একটা বিষয়। তাই একই রকম অসম্ভব একটা বিষয় দুমাসের মধ্যে উনিশ শতাংশ ভোট বেড়ে যাওয়াটা, যেটা তৃণমূলের ক্ষেত্রে এবারে হয়েছে। সেটাও দু'মাস আগে হেরে যাওয়া প্রার্থীর ক্ষেত্রে। কয়েকদিন আগেই রানাঘাট দক্ষিণে ৩৬ শতাংশ ভোট পাওয়া কৃষ্ণ কল্যাণী এবারে এক ঝটকায় বেড়ে ৫৫ শতাংশ। ভাবা যায়! ঠিক কতটা সন্ত্রাস আর ভোট লুট হলে এটা সম্ভব! এই বিধানসভা কেন্দ্রের ১২৭ নম্বর বুথ জ্ঞানদাসুন্দরী প্রাথমিক বিদ্যালয়। এই ভোটকেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী পেয়েছেন মাত্র ৫২ ভোট। অপর দিকে তৃণমূল প্রার্থী পেয়েছেন ৯৭১ ভোট। বুথে মোট ভোটারদের ৯৩.৬৪ শতাংশ একাই পেয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। অথচ সদ্যসমাপ্ত লোকসভা ভোটে কিন্তু এরকম কিছু হয়নি ওই বুথে। তৃণমূলের কুখ্যাত ডায়মন্ড হারবার মডেলে এইভাবে বুথের পর বুথ লুট হয়েছে গোটা বিধানসভা এলাকা জুড়ে। প্রাপ্য ভোটের অস্বাভাবিক পরিমাণ এবং তাতে তৃণমূলের ততোধিক অস্বাভাবিক লিড বুঝিয়ে দিচ্ছে ঠিক কতটা 'স্বচ্ছভাবে' হয়েছে এই নির্বাচন!

লোকসভার নিরিখে মানিকতলায় তৃণমূলের লিভ ছিল মেরেকেটে সাড়ে তিন হাজার। দেড় মাসের ব্যবধানে সেটা নাকি বেড়ে হয়ে গেল ৬৩ হাজার! মাথায় রাখতে হবে একটা বিধানসভায় মোট প্রদত্ত ভোট এক থেকে দু'লাখের মধ্যে ঘোরাফেরা করে (মানিকতলায় সেটা ১ লক্ষ ১৫ হাজার)। সেখানে দেড় মাসের মধ্যে সাড়ে তিন হাজার থেকে ৬৩ হাজার ব্যবধান হয়ে যাওয়াটা সুষ্ঠুভাবে ভোট হলে কোনভাবেই সম্ভব নয়। লক্ষণীয় বিষয় হল এই পুরো ছাপ্পা রাজত্বে বাম বা কংগ্রেসের ভোট কিন্তু বিশেষ হের ফের করা হয়নি। যা লুট হয়েছে সেটা বিজেপি আর হিন্দুদের ভোট।

লোকসভা এবং বিধানসভার প্রেক্ষিত সম্পূর্ণ আলাদা হয়। সেখানে ভোট শতাংশে কিছুটা এদিক-ওদিক হওয়াটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। যেমন এর আগের টার্মে রাজস্থানে কংগ্রেস সরকার ক্ষমতায় এলেও লোকসভায় একটি বাদে সবকটি আসনে জিতেছিল বিজেপি। সেখানেও ভোট শতাংশে এত বদল হয়নি। কোন সর্বভারতীয় রাজনৈতিক দল লোকসভা এবং বিধানসভার নিরিখে তিন চার শতাংশ ভোট কম বেশি পেতেই পারে। কিন্তু মাত্র দু মাসের ব্যবধানে প্রায় ২০-২৫ শতাংশ ভোটের সুইং স্বাধীন ভারতের নির্বাচনী ইতিহাসে বিরল। যেমন বাকি দেশে বিরল তৃণমূলের ভোট সন্ত্রাস, যাতে পশ্চিমবঙ্গের তৃণমূল সরকার ডক্টরেট করে নিয়েছে।

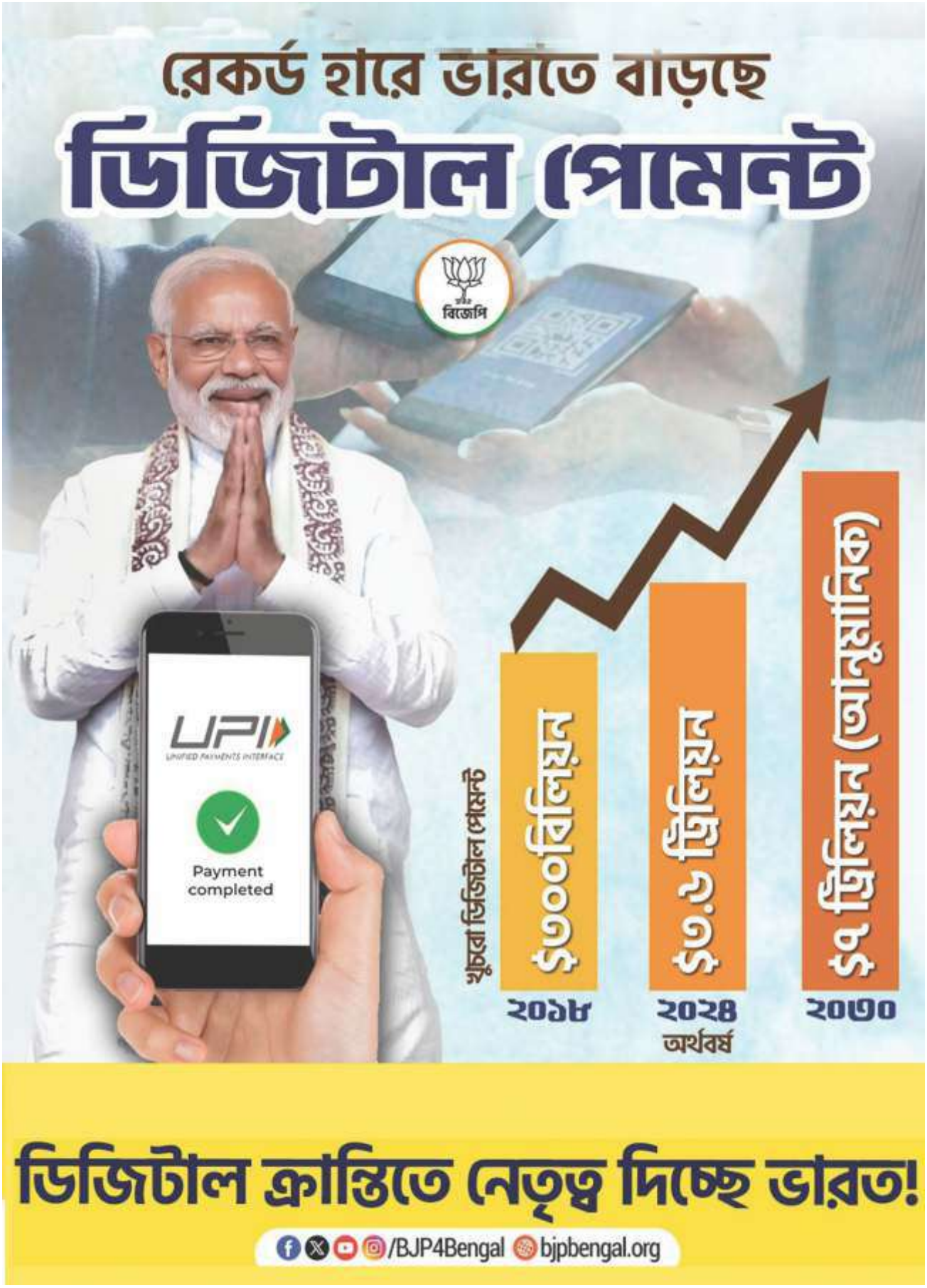
রেকর্ড হারে ভারতে বাড়ছে
ডিজিটাল পেমেন্ট
বিজেপি
UPI
UNIFIED PAYMENTS INTERFACE
Payment completed
খুচরো ডিজিটাল পেমেন্ট
$৩০০বিলিয়ন
২০১৮
$৩.৬ ট্রিলিয়ন
২০২৪
অর্থবর্ষ
$৭ ট্রিলিয়ন (আনুমানিক)
২০৩০
ডিজিটাল ক্রান্তিতে নেতৃত্ব দিচ্ছে ভারত!
/BJP4Bengal
bjpbengal.org

ফিরহাদ হাকিমের বিষাক্ত মন্তব্য
হিন্দুদের আসন্ন বিপদ

সৌভিক দত্ত

হিন্দুদের অপমান করাটাই এরাজ্যে এখন স্বাভাবিক বিষয়। তাই অমুসলিমদের দুর্ভাগা বলাতে কার কী মান সম্মানে লাগল তা যতটা গুরুত্বপূর্ণ,তার থেকেও অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ হল, এই শহর কলকাতার বুকে একজন রাজনৈতিক ব্যক্তি নেতাজি সুভাষের চেয়ারে বসে অনায়াসে হিন্দুদের (অমুসলিমদের) দুর্ভাগা বলে দিতে পারেন।

ভারতবর্ষ ধর্মনিরপেক্ষ দেশ। যদিও ধর্মের ভিত্তিতে অখন্ড ভারত ভাগ হয়েছিল,কিন্তু তারপরেও ভারতকে ধর্মনিরপেক্ষ দেশ হতে হয়েছে। আর '৪৭ এ ভাগ হয়ে সৃষ্টি হওয়া পাকিস্তান হয়েছে পুরদস্তুর ইসলামী দেশ। এতটাই ইসলামী যে কোনও অমুসলিম সেখানে রাষ্ট্রপতি পর্যন্ত হতে পারে না। অপর এক খন্ড বাংলাদেশেও রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম অর্থাৎ অমুসলিমরা সাংবিধানিকভাবেই সেখানে দ্বিতীয় শ্রেনীর নাগরিক। এছাড়া দুই দেশেই হিন্দু জনসংখ্যা ক্রমান্বয়ে কমে আসা তো আছেই। ২০২৩ এর আদমদসুমারি হিসাবে পাকিস্তানে হিন্দু জনসংখ্যা ২.১৭% আর বাংলাদেশে হিন্দু আছে ৭.৯৫%(২০২২ আদমসুমারি)!

আর এই দুই মরুভূমির মাঝেই একা কুম্ভ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ভারতবর্ষ। এই দেশ যে অহিন্দুদের শুধু আশ্রয়ই দিয়েছে তা নয়,বরং বাংলাদেশ - পাকিস্তানের বিপরীতে গিয়ে তাদের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাওয়ার পরিবেশ রক্ষা করে গেছে। ১৯৫১ সালে যেখানে মুসলিম জনসংখ্যা ছিলো ৯.৮% সেখানে ২০১১ এর আদমশুমারিতে ভারতের মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ১৪.২%! অর্থাৎ ভারত কিন্তু পাকিস্তান বা বাংলাদেশের মতো পরধর্ম বিদ্বেষী হয়নি। এবং আরো যেটা গুরুত্বপূর্ণ,ভারতের এই ধর্মনিরপেক্ষতা কিন্তু এসেছে কিছুটা আশ্চর্যজনকভাবেই। মানে দেশভাগের আগে অখন্ড ভারতকে সম্মুখীন হতে হয়েছিল ক্রমাগত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা

হাঙ্গামার! নোয়াখালী থেকে শুরু করে গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং সহ অসংখ্য হিন্দু গণহত্যা দেখেছে এই দেশ। ফলে কিছুটা বাধ্য হয়েই হিন্দু নেতাদের মেনে নিতে হয় আলাদা ইসলামী রাষ্ট্রের কথা অর্থাৎ দেশ ভাগের কথা। সেই হিসাবে ভারত রাষ্ট্রের স্বাভাবিক প্রকৃতি হওয়া উচিত ছিল সাম্প্রদায়িক। কিন্তু ভারত তা হয়নি। এমনকি দেশভাগের পরেও এই দেশ দেখেছে উদ্বাস্তুর অব্যহত স্রোত। উদ্বাস্তুদের মুখে শুনেছে প্রতিবেশী দেশে হিন্দুদের উপরে নৃশংস অত্যাচারের গল্প।

কিন্তু তবুও এই দেশ সাম্প্রদায়িক হয়নি। হ্যাঁ ভোটব্যাঙ্কের স্বার্থে কিছুক্ষেত্রে ব্যতিক্রম হয়েছে ঠিকই, পক্ষপাতিত্ব অবশ্যই হয়েছে কিন্তু মোটের উপরে কখনোই কোনো সম্প্রদায় নিজেদের দ্বিতীয় শ্রেনীর নাগরিক মনে করেনি। কোনো সম্প্রদায় নিজেকে কখনো হতভাগ্য মনে করেনি। কোনো সাংবিধানিক বা প্রশাসনিক পদে থাকা রাজনৈতিক নেতা কখনোই কোনো সম্প্রদায়কে আলাদাভাবে দেখেননি। এটাই ভারতের চিরকালীন বৈশিষ্ট্য!

কিন্তু মাঝেমধ্যে যেন ছন্দপতন ঘটেই যায়।

কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম উন্মুক্ত সভায় মন্তব্য করলেন যে, যারা ইসলাম নিয়ে জন্মায়নি তারা দুর্ভাগা। বললেন যারা দুর্ভাগ্য নিয়ে জন্মেছে, যারা ইসলাম নিয়ে জন্মায়নি, তাদের দাওয়াত - এ - ইসলাম অর্থাৎ ইসলামে দাওয়াত দিয়ে তাদের ইসলামের মধ্যে নিয়ে আসার কথা। সমস্ত কলকাতা তথা ভারতের সব শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ বিস্ময়ে হতভম্ব হয়ে গেল। এও কি সম্ভব? একজন প্রশাসনিক ব্যক্তির পক্ষে, একজন নির্বাচিত রাজনৈতিক নেতার পক্ষে, বিশেষত যেখানে তাকে অমুসলিমরাও ভোট দিয়েছে, কি এমন কথা বলা সম্ভব? প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে এর আগে একবার কলকাতার এক অংশকে মিনি পাকিস্থান বলে উল্লেখ করেছিলেন ফিরহাদ হাকিম। যে পদে একদিন নেতাজী সুভাষ, চিত্তরঞ্জন দাস বা বিধান চন্দ্র রায়ের মত ব্যক্তিরা বসেছিলেন, সেই পদে বসে এমন সব মন্তব্য যথেষ্টই বিব্রতকর। প্রশাসনিক ক্ষমতা শুধু ক্ষমতাই নয়, এটা একটা দায়িত্ব। একজন ব্যক্তির নির্দিষ্ট ধর্মীয় বিশ্বাস থাকতেই পারে। একজন ব্যক্তি নির্দিষ্ট কোনো ধর্মের প্রতি বিদ্বেষ ভাব রাখতেই পারেন। নৈতিকভাবে তা ঠিক নাকি বেঠিক তা নিয়ে প্রশ্ন থাকতেই পারে তবে কারো ব্যক্তিগত বিশ্বাস নিয়ে আমাদের প্রশ্ন তোলার কিছুই নেই। কিন্তু সেই ব্যক্তি যখন কোনো নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি হন আর এই ভয়ঙ্কর কথা জনসম্মুখে বলা হয়, তখন তা আর ব্যক্তিগত বিষয় থাকে না বরং গণতন্ত্রের জন্যে তা এক ভয়ঙ্কর বিপদ হয়ে ওঠে। একজন মেয়র যদি ধর্মের ভিত্তিতে তার শহরের নাগরিকদের সৌভাগ্যবান আর দুর্ভাগাতে ভাগ করতে শুরু করে দেন, তবে সেই শহরের মতো দুর্ভাগা শহর আর একটাও নেই। এর আগেও শহর কলকাতা ধর্মের ভিত্তিতে নৃশংস অত্যাচার দেখেছে। '৪৬ সালে তৎকালীন বাংলার প্রধানমন্ত্রী (বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীর সমতুল্য) হোসেন সুরাবর্দীর আমলে গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং আমরা ভুলিনি। তাই আবার কোনো শাসকের মুখে সাম্প্রদায়িক বিভাজন দেখলে ঘরপোড়া গরু হয়ে ভয় পেতে হয় বৈকি। কিন্তু প্রশ্নটা হল কলকাতার মেয়রকে কেন এমন মন্তব্য করতে হল? বা বলা চলে কলকাতার মেয়র কেন জনসম্মুখে এমন মন্তব্য করতে পারলেন? হিন্দুদের দুর্ভাগা বলতে কি তার একবারও মনে হল না তার ভোটার হিন্দুদের কথা? কিংবা প্রশ্নটা হয়তো উল্টো করে করা উচিত - হিন্দুরা কেন নিজেদের অস্তিত্বের কথা স্মরণ করাতে পারলো না তাদের মেয়রকে?

আর এই প্রশ্নেই হয়তো লুকিয়ে আছে কলকাতার আসন্ন বিপদেরই প্রতিচ্ছবি। যে, কলকাতায় হিন্দুরা এতটাই অপ্রাসঙ্গিক হয়ে গেছে যে তাদের ভালোলাগা-খারাপলাগা শাসক দলের কাছে স্রেফ মূল্যহীন। হিন্দুরা ভোটব্যাঙ্ক কোনোদিনই ছিলো না এই রাজ্যে। এখনও নেই। মুসলিমরা যেখানে ভোট দেয় কোন দল তাদের সম্প্রদায়ের স্বার্থের জন্য লাভদায়ক হবে তা দেখে, সেখানে হিন্দুরা ভোট দেয় কেউ মার্ক্স লেনিনের বই পড়ে, কেউ অমুক লেখকের লেখা পড়ে, কেউ পারিবারিক রীতিনীতি মেনে, কেউ ভোটপ্রার্থীর সাথে নিজের কাস্ট - সাবকাস্ট - লিঙ্গ ইত্যাদি মিলিয়ে। আমি ব্যক্তিগতভাবে এমনও লোক দেখেছি (অবশ্যই হিন্দু) যে ভোট দেয় কোনো এক নির্দল প্রার্থীকে। কেন? না, ওদের তো কেউ ভোট দেয় না তাই আমিই দিয়ে দি। গণতান্ত্রিক ক্ষমতার কী নিদারুণ অপচয়! আবার কিছু আঁতেল নিজেদের প্রাতিষ্ঠানিকতাবিরোধী মনোভাব দেখাতে ভোট দিয়ে আসে নোটা তে। মানে মোটের উপরে হিন্দুদের ভোট কখনোই একজায়গায় পরে না। হিন্দুরা ভোটব্যাঙ্ক নয়। হিন্দুদের ভালো হল নাকি খারাপ হল, হিন্দুদের সম্মান হল নাকি অপমান হল তা নিয়ে মাথা না ঘামালেও রাজনৈতিক দলদের চলে কারণ হিন্দুরা নিজেরাই এসব নিয়ে মাথা ঘামায় না। মান অপমানের কথা ছেড়েই দিলাম। দীর্ঘদিনের বাম শাসনের ফলে যে হিন্দু বিরোধী আবহ এই রাজ্যে তৈরী হয়েছে তাতে হিন্দুদের অপমান করাটাই এখানে অতি স্বাভাবিক বিষয়। তাই অমুসলিমদের দুর্ভাগা বলাতে কার কী মান সম্মানে লাগল তা যতটা গুরুত্বপূর্ণ, তার থেকেও অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ হল এটাই যে এই শহর কলকাতার বুকে একজন রাজনৈতিক ব্যক্তি নেতাজী সুভাষের চেয়ারে বসে অনায়াসে হিন্দুদের (অমুসলিমদের) দুর্ভাগা বলে দিতে পারেন। তাদের ধর্ম পরিবর্তন করানোর কথা মুখে আনতে পারেন। নাগরিক সমাজ কোনো প্রতিবাদ করে না। হিন্দুরা এখানে এতটাই গুরুত্বহীন ও মেরুদন্ডহীন প্রাণী হয়ে গেছে।

ফিরহাদ হাকিম কী বলেছে তা অবশ্যই চর্চার বিষয়। কিন্তু কেন বলার সাহস পেলো তা চর্চার জন্যে আরো অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করি।

রাজধানী কলকাতাতে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যাওয়া হিন্দুরা তা বুঝতে পারছে কি? আর সভ্যতার যুদ্ধে অপ্রাসঙ্গিক জনসমাজের জন্যে ইতিহাস কোন পরিণতি নির্দিষ্ট করে রাখে তাও নিশ্চয়ই আলাদা করে বুঝিয়ে দিতে হবে না। বিষয়টা হিন্দুরা যত তাড়াতাড়ি বুঝবে ততই মঙ্গল।

পশ্চিমবঙ্গের ভোট

অন্য রাজ্যের থেকে আলাদা

ডঃ নারায়ণ চক্রবর্তী

২০২৪-এর 'ভোট যুদ্ধ' শেষ হল। সারা দেশে যা ভোট উৎসব, এই রাজ্যে সেটা ভোট যুদ্ধ! এই তফাৎটা 'গণতান্ত্রিক' ভোট চলার সময় প্রতিটি স্তরে স্পষ্ট অনুভব করা যায়। বিধান চন্দ্র রায়ের সময় পর্যন্ত রাজ্যের রাজনীতিতে রাজ্যে উন্নয়নের প্রশ্নে যেমন দলমত নির্বিশেষে সকল রাজনীতিক একমত হতেন, তেমনি তাদের একমাত্র রোজগার ও জীবন ধারনের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ রাজনীতির মাধ্যমে আসত না। কিন্তু এখন রাজনৈতিক নেতাদের রোজগারের মূল উৎস রাজনীতি! এক সময় দেশ সেবার মাধ্যম হিসেবে রাজনীতিকে দেখা হত। এখন এটি একটি অত্যন্ত লাভজনক প্রফেশন। যেজন্য বিভিন্ন ভোটের সময় প্রার্থীরা তাদের প্রফেশন হিসেবে রাজনীতিকে উল্লেখ করেন। এই পরিবর্তনের একটি classical উদাহরন কোলকাতা উচ্চ আদালতে মাননীয় বিচারক অমৃতা সিনহা মহাশয়ার আদালতে দেখা গেছে। একজন পঞ্চায়েত প্রধান, তিনি রাজ্যের শাসক দলের প্রতিনিধি, নিরক্ষর হলেও যখন পঞ্চায়েত প্রধান হিসেবে বিভিন্ন শংসাপত্র দেন সেগুলো কিভাবে তিনি তথ্য ভেরিফিকেশন করেন, সে বিষয়ে বিচারপতি তাঁকে প্রশ্ন করলে তিনি প্রথমে বলেন, তাঁর স্বামী বলে দেন! যখন বলা হল, তাঁর স্বামীও নিরক্ষর, তখন তিনি বললেন, ইন্টারনেটে পাওয়া যায়!

যে জায়গায় জনপ্রতিনিধি নির্বাচন এমন হবে, সেখানে oligopolistic control-এর মাধ্যমে জনগণ তো বটেই, গণতন্ত্রেরও কণ্ঠরোধ করা হয় - তা পরীক্ষিত সত্য। এই রাজ্যের মানুষের অভিজ্ঞতাও এক। বিধান চন্দ্র রায়ের মৃত্যুর পর প্রফুল্ল চন্দ্র সেনের মুখ্যমন্ত্রীত্বের সময় থেকে পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থী আন্দোলন মুক্ত গণতান্ত্রিক পরিবেশের সুযোগ নিয়ে বাড়তে থাকে। এই আন্দোলন ক্রমশঃ যখন সহিংস রূপ পেতে থাকে, তখন রাজনীতির জগতে লুম্পেন প্রলেতারিয়েতদের গুরুত্ব বাড়তে থাকে। পরবর্তী সময়ে,বিশেষ করে ১৯৬৭ থেকে ১৯৭২ সালের অস্থিরতার সুযোগে রাজ্যে লুম্পেন রাজ প্রতিষ্ঠার কয়েকটি পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলতে থাকে। তারপর আসে ১৯৭২ থেকে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে পুলিশরাজ এবং রাজনৈতিক হত্যার ঘণঘটা। রাজনীতিকে অবলম্বন করে ব্যাক্তিগত ক্ষমতার শীর্ষে বিচরণ করার শর্টকাট মেথড অনুসরণ করা হয়। পরবর্তী জরুরী অবস্থায় 'কবরের শান্তি' কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের অশান্তি আরো বাড়িয়ে তোলে। এর দায় ঐ সময়ের যে রাজনৈতিক নেতাদের, ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাসে সেই নেতাদের দলগুলিই এখন জোটবদ্ধ নির্বাচনের শরিক। এটি রাজ্যবাসীর কাছে এক নির্মম কৌতুক! ঐ দলগুলির ঐ সময়ের কাজের জন্য একজনও বর্তমান রাজনৈতিক নেতা বাঙ্গালীর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা দূরের কথা, ভুল স্বীকার পর্যন্ত করেননি। কারন, এরা মানুষকে মনুষ্যেতর জীবের উপরে কিছু মনে করেন না। তাঁরা জানেন, কিভাবে এই 'ভোটার'দের যুথবদ্ধভাবে তাঁদের প্রতীকে ভোট 'করাতে' বাধ্য করতে হয়! সে সময়ের আরেকটি বড় অবদান - পশ্চিমবঙ্গের পুলিশ ও প্রশাসনকে শাসকের ইচ্ছায় শাসক রাজনৈতিক দলের পক্ষে ব্যবহার করা। যত সময় গেছে, রাজ্যের হতভাগ্য জনসাধারণ এই দলদাস পুলিশ-প্রশাসন ও শাসক রাজনৈতিক দলের কাছে আত্মসমর্পণে বাধ্য হয়েছে।

যেহেতু গত ৫৭ বছর ধরে পশ্চিমবঙ্গের শাসক দল রাজ্যে শিল্প বিরোধী সরকার চালিয়েছে, তাদের বিভিন্ন কাজকর্মে এই রাজ্যের মানুষকে কর্মবিমুখ বানিয়ে দিয়েছে! এ সম্পর্কে ইনফোসিস কর্তা টি এ পাই তার X-হ্যান্ডেলে যে বক্তব্য রেখেছেন তা অত্যন্ত সঠিক। তিনি লিখেছেন, "সম্ভ্রান্ত এবং শিক্ষিত বাঙালি এখন বাংলা-ছাড়া। তাঁরা এখন ভারতের বাকি অংশকে গড়ে তুলছেন। বাংলার রাজনীতি নিম্নগামী এবং সেরা ও উজ্জ্বল সন্তানদের রাজ্যছাড়া করছে। এটা দুঃখের কথা যে, একদা মহান রাজ্যটি এখন অতীতের ছায়ামাত্র এবং তার কোনও আশা নেই।" এমন মানুষের বক্তব্য থেকে পরিষ্কার যে, বাংলার দুটি প্রজন্ম রাজনৈতিক সুবিধাবাদের যুপকাঠে বলি হয়েছে। এখনো রাজনৈতিক নেতারা এবং তাদের অন্ধ সমর্থকবৃন্দ রাজ্যের সব অপকর্মগুলিকে তারস্বরে উন্নয়ণ বলে চালাতে চেষ্টা করছে। এমন অন্ধকারের রাজনীতির ফল - গত দু দশকে রাজ্যের ভূমিপুত্রদের সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা, যেমন, IAS, IPS ইত্যাদিতে সাফল্যের হার কমতে কমতে প্রায় শূণ্যের কোঠায় এসে দাঁড়িয়েছে। এই ভূমিপুত্রদের একসময়ের গর্ব বাংলার ফুটবল এখন এমন জায়গায় যে ভারতীয় একাদশে তাদের আর দেখা যায় না। সর্বভারতীয়স্তরে লেখাপড়া, খেলাধুলা - সব ক্ষেত্রেই বাংলার স্থান একেবারে পেছনে। শুধুমাত্র প্রিপোল, পোল ডে এবং পোস্ট পোল ভায়োলেন্সে বাংলা অপ্রতিরোধ্যভাবে প্রথম স্থানে। শিল্পের ক্ষেত্রে বলা যায় রাজ্যের মূখ্যমন্ত্রীরা বিভিন্ন সময় শিল্পপতি ধরে আনতে বিদেশে দলবলসহ প্রমোদ ভ্রমণ করেছেন! এখন আবার নতুন টেকনিক "বিশ্ব বাণিজ্য

সম্মেলন"! অবশ্য সবেরই নিট ফল শূণ্য। গত দশ বছরের মধ্যে আমরা জানি টাটারা সিঙ্গুরের কারখানা অসম্পূর্ণ রেখে পালিয়েছে। কিন্তু কটা নতুন কারখানা তৈরি হয়েছে তার তালিকা কি কোন শাসকদলের নেতা দিতে পারবেন? আসলে কাটমানি, দলীয় নেতাদের আর্থিকভাবে খুশী করার বাধ্যবাধকতার সঙ্গে প্রশাসনিক ও পুলিশের জন্য উপযুক্ত জায়গায় উপযুক্ত "তৈল দান" করার পর যখন শিল্প মালিকদের মানসিকভাবে কর্মবিমুখ শ্রমিকদের দিয়ে তাদের শিল্প চালাতে হবে, তখন লাভের ঘরে শূণ্য এবং লোকসান প্রায় পুরোটাই। তারপর টাটাদের বিতারণ পদ্ধতি এমন যে সারা দেশ তথা বিশ্বের কাছে এমন নেগেটিভ বার্তা গেছে, আর কোন শিল্পদ্যোগী এই রাজ্যে বিনিয়োগে আগ্রহী নন। এমনকি রাজ্যের থেকে বিশেষ সুবিধা নেওয়া পুরোনো শিল্পপতিরাও তাদের diversification করার সময় অন্য রাজ্যকে বেছে নিচ্ছেন! এর সবচেয়ে বড় কারন হল, সামাজিক এবং রাজনৈতিকভাবে রাজ্যের সধারণ মানুষকে ভাতা নির্ভর ও রাজনৈতিক দলের কর্মকান্ড নির্ভর জীবিকা নির্বাহে বাধ্য করা। এর একটা বড় বাধ্যবাধকতা হল, রাজ্যের শাসকদলের ক্ষমতায় থাকা। কারন পশ্চিমবঙ্গে গত ৬০ বছরে আমরা রাজ্যের মূখ্যমন্ত্রী পাইনি। পেয়েছি শাসকদলের মূখ্যমন্ত্রী। তা না হলে শাসকদলের নেতা মন্ত্রীরা বলতে পারেন যে, তাঁরা বিশেষ এলাকায় সরকারি সুবিধা বন্ধ করে দেবেন কারন এই এলাকার মানুষ শাসকদলকে ভোট দেয়নি! অর্থাৎ, রাজ্যের মানুষের স্বোপার্জিত জীবিকার পথ বন্ধ করে দিয়ে শুধুমাত্র শাসকদলের সমর্থক তৈরী করে রাখা তাদের বেঁচে থাকার রসদ জোগাড়ের জন্য। এখানে সে কারনেই কোন ইজম, নীতি কিছুই খাটে না। এক বিপুল সংখ্যার মানুষ তাদের জীবিকার প্রয়োজনে বাধ্য হয় শাসকদলের দাসবৃত্তি করতে। এই রাজ্যে শাসকদলের দাস না হলে কোন অটোরিকশা চালকের গাড়ি রাস্তায় নামতে দেওয়া হয় না। কোন সংবাদপত্র বিক্রেতা সরকারি দলের অমতে সংবাদপত্র বিক্রি করতে পারবে না। এমন regimentation এক সময় জেহাদী ফতোয়ায় কাশ্মীরে ছিল। এখন পশ্চিমবঙ্গে শাসকের ফতোয়া মেনে সবাইকে চলতে হবে তাই নয়, বিরোধী দল কতটা বিরোধীতা করবে বা বিরোধীতার অভিনয় করবে, সেটাও শাসকদলের ফতোয়ায় ঠিক করে দেওয়া হয়।

এমতাবস্থায় শাসকের ইচ্ছেয় এই রাজ্য bulk voting, এবং জাল ভোট ও ভয়-ভীতিতে বিশেষ প্রার্থীর চিহ্নে ভোট দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রশাসনিক মদতে ভোট গণনায় কারচুপি ইত্যাদি গণতান্ত্রিক ভোট প্রক্রিয়াকেই উপহাস করে চলেছে। সেজন্য এই রাজ্যে শাসক রাজনৈতিক দলের পরিবর্তন সহজে হয় না। অন্ততঃ "মেরেছ কলসীর কানা, তাই বলে কি প্রেম দেবোনা" গোছের বিরোধীতা শাসকের ইচ্ছাতেই শিলমোহর দেয়। তাছাড়া, এই রাজ্যে একটি রাজনৈতিক পরম্পরা হচ্ছে targeted opposition and friendly opposition! এই দুইয়ের জাঁতাকলে পরে সাধারণ মানুষ কিছুটা হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছে।

এমতাবস্থায় এই প্রান্তিক রাজ্যকে বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গিতে না দেখলে ভবিষ্যতে রাজ্যের তথা পূর্ব ভারতের পরিস্থিতি গত শতাব্দীর শেষপাদ থেকে বছর কয়েক আগের কাশ্মীরের থেকেও ভয়ানক হবে। তার একটা বড় কারন হচ্ছে তুচ্ছ রাজনৈতিক স্বার্থের কারনে আমাদের দেশের বেশকিছু রাজনৈতিক নেতার বিদেশী জেহাদীদের মদত দেওয়া। বিশেষ করে এই রাজ্যের লাগোয়া প্রতিবেশী দেশ, যেটি নিজেদের লড়াইয়ের মাধ্যমে স্বাধীনতা লাভের সময় প্রভূতভাবে ভারতের সাহায্যে জয় হাসিল করেছিল, তারা সেই জয় যেহেতু কঠোর পরিশ্রম ও বিস্তর ত্যাগের বিনিময়ে পায়নি, তাদের এক বড় অংশ দেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও ভারতের অবদান ভুলে গিয়ে বৃহত্তর ধর্মীয় ভ্রাতৃত্বের নামে ভারতে জেহাদী বিচ্ছিন্নতাবাদে সরাসরি মদত দিচ্ছে। যদিও সে দেশের সরকার চেষ্টা করছে এই ঘৃণ্য কাজে তাদের মাটি যাতে ব্যবহার না করা হয়, তবু এখনো জেহাদী অপশক্তি এই কাজে যথেষ্ট সক্রিয়।

যেহেতু পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষের কর্মসংস্থানের জায়গাটা সরকারি নীতির কারনেই দিনকে দিন সংকুচিত হয়ে আসছে এবং কর্ম বিনিয়োগের সংখ্যা ক্রমশঃ কমছে, এই রাজ্যের মানুষ ধীরে ধীরে অনুদান নির্ভর হয়ে পড়ছে। ওদিকে রাজ্যের সরকার যেহেতু মানুষকে ডোল নির্ভর জীবনে যেতে বাধ্য করছে, সেজন্য এখানে নিয়ন্ত্রিত গণতন্ত্রকে মুক্ত গণতন্ত্র বলে চালানো হচ্ছে! অনেক রাজনীতির বোদ্ধা বলেন, এখানে বিরোধী দল কোনো আন্দোলন করে না! তাই তাদের বুথস্তরে সংগঠণ হচ্ছে না। সেজন্য তারা ভোটে হারছে! আমার সাদা মনে সাদা প্রশ্ন - সেটা হল, আপনারা স্বীকার করলেন যে, পশ্চিমবঙ্গে ভোট 'করাতে' হয় এবং তার জন্য যুথবদ্ধ পেশী শক্তি, যাকে ভদ্রভাষায় 'বুথস্তরে সংগঠণ' বলে, তা বিরোধীদের নেই। এটা সত্যি হলেও যা আপনারা বলছেন না, সেটা হল এই রাজ্যে রাজনৈতিক পেশীশক্তির সঙ্গে দলদাস পুলিশ ও প্রশাসন শাসক দলের একটি উইং হিসেবে কাজ করে বলে এখানে বিরোধীদের কার্যকরী আন্দোলন গড়ে তোলার স্পেস দেওয়া হয় না। যদি এটি একমাত্র বিরোধী দল বিজেপির অপদার্থতা হত, তাহলে এ কাজে বিশেষ পারদর্শী বামপন্থীরা 'ইন্সাফ যাত্রা'সহ বিভিন্ন গণ আন্দোলন গড়ার চেষ্টা করেও ২৯ টি আসনে প্রার্থী দিয়ে ২৭টিতে তাদের জামানত জব্দ হল কেন? সন্দেশখালিতে বিরোধি রাজনীতি তীব্র আন্দোলন গড়ার মুখে কিভাবে পুলিশ ও প্রশাসন তা গুঁড়িয়ে দিয়ে শাসকদলকে স্বস্তি দেয় তা সবাই জানে। আসলে এ রাজ্যে মুক্ত গণতান্ত্রিক পরিবেশ না থাকায় এখানে গণতান্ত্রিক উপায়ে এই ব্যবস্থায় মুক্ত ও স্বাধীনভাবে ভোটের ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়। একমাত্র দ্বিতীয় কাশ্মীরের দিকে রাজ্যকে ঠেলে দেওয়ার দায় তখন শাসক ও বিরোধী, সব রাজনৈতিক দলের উপরেই বর্তাবে।

সুতরাং এই রাজ্যে বর্তমান পরিস্থিতিতে কখনোই সব মানুষের মতামত ভোট বাক্সে প্রতিফলিত হয় না। এখানে bulk voting ও forced voting এর সঙ্গে প্রশাসনিক রিগিং সর্বদাই ভোটের ফলাফলকে প্রভাবিত করে।

আমাদের সঙ্কল্প
বিকশিত পশ্চিমবঙ্গ
বিকশিত ভারত

পশ্চিমবঙ্গের
উন্নয়নে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ

গত ৫ বছরে কেন্দ্র রাজ্যকে দিয়েছে
৫.৩৬ লক্ষ কোটি টাকা

এছাড়াও রাজ্যবাসী উপকৃত হয়েছে খাদ্যে ৮০,০০০ কোটি এবং সার-এর ক্ষেত্রে ৩০,০০০ কোটি টাকার কেন্দ্রীয় ভর্তুকিতে

সম্মান, অধিকার, সুযোগসুবিধা 'জনজাতি সম্প্রদায়' -এর জন্য

৮৩৪ কোটি টাকা গত ৬ বছরে বাংলাকে দেওয়া হয়েছে জনজাতি কল্যাণে

২৩১ কোটি টাকারও অধিক বৃত্তি দেওয়া হয়েছে জনজাতি ছাত্র ছাত্রীদের

আয়ুষ্মান পশ্চিমবঙ্গ

১২,০০০ কোটি স্বাস্থ্য পরিকাঠামোয়

আয়ুষ্মান ভারত ডিজিটাল মিশন

৩.২৪ কোটির বেশী আয়ুষ্মান ভারত হেলথ অ্যাকাউন্ট তৈরি হয়েছে

আয়ুস পরিষেবা ক্ষেত্রে (২০১৪-২৩) ১২৯ কোটির সহায়ক অনুদান

প্রধানমন্ত্রী জনৌষধি প্রকল্প

- সুলভে সেরা মানের ঔষধ
- রাজ্যে চলছে ৩৫৯টি জনৌষধির দোকান
- ১,১৪৬ কোটি টাকার সাশ্রয় গত ৫ বছরে

গত ৫ বছরে **৩টি ইএসআইসি হাসপাতাল** স্থাপিত হয়েছে দার্জিলিং, উঃ ২৪ পরগনা, পশ্চিম মেদিনীপুর এবং দঃ ২৪ পরগণায়

মৌলিক পরিকাঠামো নির্মাণ
দরিদ্র মানুষের জন্য

- **৯৩,১৭১ কোটি টাকা** পশ্চিমবঙ্গকে দেওয়া হয়েছে গ্রামীণ উন্নয়নে
- **১১,৭৯২ কোটি টাকা** দেওয়া হয়েছে '১০০ দিনের কাজে' MGNREGA **(২০২১-২২)**,যা একটি অর্থবর্ষে দেওয়া দ্বিতীয় সর্বোচ্চ পরিমাণ অর্থ
- গ্রামীন উন্নয়নের ক্ষেত্রে সর্বদা **সর্বোচ্চ পরিমাণ টাকা** পেয়েছে পশ্চিমবঙ্গ
- **২,১৫১ কোটি টাকা** দেওয়া হয়েছে স্বচ্ছ ভারত মিশন (গ্রামীন)-এ
- **১৩,৪৬৯ কোটি টাকা** দেওয়া হয়েছে নগর উন্নয়নে
- **৪,৮৯,৯৫৯ টি ঘরের অনুমোদন** পেয়েছে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা (শহর)
- **বিনামূল্যে খাদ্যশস্য বিতরণ** করা হয়েছে প্রধানমন্ত্রী গরীব কল্যাণ অন্ন যোজনার অধীন ৬ লাখেরও বেশী মানুষকে

স্টার্ট আপ ইন্ডিয়া ও স্কিল ইন্ডিয়া

- **৪,০২৬** স্বীকৃত স্টার্ট আপ
- **মহিলা পরিচালিত ৫১%-এর অধিক স্টার্ট আপ**
- **৪১৫ কোটি টাকা** দেওয়া হয়েছে প্রধানমন্ত্রী কুশল বিকাশ যোজনায় (PMKVY)
- **৬.৭৪ লক্ষ প্রার্থীকে দক্ষতার প্রশিক্ষণ PMKVY** এবং **JSS** যোজনার অধীন

শিল্পদ্যোগ উন্নয়ন উদ্যোগ
(ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফরএন্টারপ্রেনারশিপ অ্যান্ড স্মলবিজনেস ডেভেলপমেন্ট)

- **ITI/NSTI-এর ২,৫০৯ জন লাভার্থীকে এন্টারপ্রেনারশিপ অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম** এবং **১,৩৪৮ জন লাভার্থীকে এন্টারপ্রেনারশিপ ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামে যুক্ত করেছে** ইনস্টিটিউট
- **PMYUVA পাইলট প্রোজেক্টের অধীন ৬,৯৫৫ জন লাভার্থীকে প্রশিক্ষণ** দিয়েছে ইনস্টিটিউট
- **SANKALP প্রোজেক্টের অধীন ৪০০ জন লাভার্থীকে প্রশিক্ষণ** দিয়েছে ইনস্টিটিউট
- **JSS প্রোজেক্টের অধীন 56 জন লাভার্থীকে প্রশিক্ষণ** দিয়েছে ইনস্টিটিউট

কৃষি কল্যাণ নিশ্চিত করতে

- **৩০,০০০ কোটি** টাকার সার-এ ভর্তুকি গত ৫ বছরে
- **৮,৪৯২ কোটি টাকা** দেওয়া হয়েছে প্রধানমন্ত্রী কিষাণ যোজনায়
- ২০ লাখ কিষাণ ক্রেডিট কার্ডে **১০,৯৭২ কোটি টাকা** মূল্যের ঋণ সীমা ধার্য করা হয়েছে
- **২৩০ কোটি টাকার** সহায়ক অনুদান দেওয়া হয়েছে প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্পদ যোজনায়
- **২৮৩ কোটি** গত ৬ বছরে দেওয়া হয়েছে পশুপালন ক্ষেত্রে
- **৭৮ কোটি টাকা** দেওয়া হয়েছে নীল বিপ্লব ও প্রধানমন্ত্রী মৎস্য সম্পদ যোজনায়

নারী শক্তি

৫,৭৪৪ কোটি টাকা গত ৬ বছরে দেওয়া হয়েছেনারী শক্তি বিকাশে

৫,২৩৯ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে **মিশন সক্ষমঅঙ্গনওয়াড়ি এবং পুষ্টি ২.০** যোজনায়

১৭১ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে **মিশন বাতসল্য** যোজনায়

৩৩৪ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে **মিশন শক্তি** যোজনায়

১৯,৫৯৫ কোটি টাকা গত ৬ বছরে দেওয়া হয়েছে **জল জীবন মিশনে**

সুকন্যা সমৃদ্ধি যোজনার অধীন **১৪ লাখের বেশী অ্যাকাউন্ট** খোলা হয়েছে কন্যা শিশুদেরজন্য

প্রান্তিক মানুষদের জন্য সামাজিক সুরক্ষা

প্রধানমন্ত্রী জনধন যোজনা
৫.০৭ কোটি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খোলা হয়েছে

প্রধানমন্ত্রী সুরক্ষা বীমা যোজনা
২.৭৫ কোটি টাকার দুর্ঘটনা বীমার তালিকাভুক্তি

প্রধানমন্ত্রী জীবন জ্যোতি বীমা যোজনা
১ কোটি টাকার জীবন বীমার তালিকাভুক্তি

অটল পেনশন যোজনা
৪৮ লক্ষের অধিক মানুষ যুক্ত হয়েছে

প্রধানমন্ত্রী স্বনিধি যোজনা
১৯৫ কোটি টাকার বেশী বিতরণ করা হয়েছে ১.৭৯ লাখ লাভার্থী-কে

প্রধানমন্ত্রী মুদ্রা যোজনা

২.৩৭ লক্ষ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে

পশ্চিমবঙ্গে এমএসএমই ক্ষেত্রে অগ্রগতি এবং কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে

৩২ লক্ষ এমএসএমই-র তালিকভুক্তি উদ্যম পোর্টাল-এ। এর মধ্যে **৬৫.১৬%** উদ্যোগ মহিলা পরিচালিত

ক্রেডিট গ্যারান্টি প্রকল্পের অধীন, **২৩,১২৬** কোটি টাকা মূল্যের **২,৪৫,১১৮** টি গ্যারান্টি দেওয়া হয়েছে

প্রধানমন্ত্রী কর্মসংস্থান সৃষ্টি কর্মসূচীর অধীন, মার্জিন মানি হিসাবে **৫৭.৯৬ কোটি টাকার** ভর্তুকি **১২,৭৮৭** টি ইউনিটকে যারা **১,০২,২৯৬** টি কর্মসংস্থান তৈরি করেছে

৭,৩৫,৬৬৪ টি আবেদনপত্র গ্রহণ করা হয়েছে প্রধানমন্ত্রী বিশ্বকর্মা যোজনায়, যার মধ্যে মহিলা আবেদনকারী **২,১২,৫৩০** জন

স্ফূর্তি (SFURTI) প্রকল্পে **১৯** টি নির্বাচিত গোষ্ঠী পেয়েছে ৪৫.৪৫ কোটি টাকার কেন্দ্রীয় সহায়তা। কাজ চালিয়ে যাচ্ছে **১৪** টি গোষ্ঠী, যার মধ্যে ২ টি মহিলা কারিগর গোষ্ঠী

উদ্যোক্তা এবং দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচীর অধীন ২৫,৯৮৪ জন ৫৫৮ টি কর্মসূচী থেকে উপকৃত হয়েছে

ঐতিহাসিক স্থান পুনরুদ্ধার

- প্রসাদ প্রকল্পের অধীন **৩০.০৩ কোটি টাকা** বেলুড় মঠের উন্নয়নে
- দুর্গাপুজো-কে ইউনেসকোর **ইনট্যানজিবল কালচারাল হেরিটেজ অব হিউম্যানিটির** তালিকাভুক্ত করা

পশ্চিমবঙ্গ উপকূল এলাকা

- স্বদেশ দর্শন প্রকল্পে পশ্চিমবঙ্গে **৬৭.৯ কোটি টাকা** বাজেটে ব্যয় করা হয়েছে উপকূল এলাকা ও রাস্তার পাশে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা বাড়ানোর জন্য

শিক্ষায় সহায়তা

৬,০৪৯ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে সমগ্র শিক্ষা প্রকল্পে

৯,৬৭৪ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে প্রধানমন্ত্রী পোষণ শক্তি নির্মান প্রকল্পে

৬৯ লাখ বৃত্তি দেওয়া হয়েছে তফসিলি ছাত্রছাত্রীদের

১,৯১৬ কোটি টাকা গত ৫ বছরে দেওয়া হয়েছে কৃষি প্রতিষ্ঠানগুলির জন্য

সামুদ্রিক পরিকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে সমৃদ্ধিতে উৎসাহ দেওয়া

- **১৬,০০০ কোটি টাকা মূল্যের ৬২ টি প্রকল্পে** পরামর্শ দেওয়া হয়েছে সাগরমালা প্রকল্পে
- গত দশকে এসএমপিএ সম্পূর্ণ করেছে **১৫০৮.৬৪** কোটি টাকা মূল্যের ২৯ টি প্রকল্প। বর্তমানে **৫৫৪৫.১১ কোটি টাকা মূল্যের মত ৩৯ প্রকল্পের** কাজ চলছে
- জল মার্গ বিকাশ প্রকল্পে **হলদিয়া থেকে বারানসী (১৩৯০ কিমি) জাতীয় জলপথ- ১ উন্নয়ন**
- পণ্যসম্ভার পরিবহনে **শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি বন্দরে ক্যাপাসিটি বেড়েছে ৭০.৮৫ (২০১৪-১৫) থেকে ৯২.৭৭ (২০২২-২৩) এমটিপিএ**
- হলদিয়ায় **৫০৩.১৬ কোটি টাকা** মূল্যে মাল্টিমোডাল টার্মিনাল উন্নয়নের কাজ সম্পূর্ণ
- **৩৭৪.৫৭ কোটি টাকা** ব্যয়ে ফারাক্কায় নতুন নেভিগেশনাল লক গেট উন্নয়নের কাজ সম্পূর্ণ
- ভারতের মায়া বন্দর থেকে বাংলাদেশের সুলতানগঞ্জ বন্দর অবধি পরীক্ষামূলক নৌপরিবহণ

ঐতিহ্য সংরক্ষণও চাই উন্নয়নও চাই

- **৫৮.১০ কোটি টাকা** দেওয়া হয়েছে গুরু-শিষ্য পরম্পরা প্রচারে আর্থিক অনুদান প্রকল্পে
- **৩৪.৩০ কোটি** আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়েছে জাতীয় স্তরে পরিচিত সাংস্কৃতিক সংস্থাগুলিকে
- **১৫.৬২ কোটি টাকা** দেওয়া হয়েছে বিজ্ঞানের সংস্কৃতি প্রচার পরিকল্পনায়
- **৫.০৪ কোটি টাকা** দেওয়া হয়েছে রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরি ফাউন্ডেশনে
- **৩.০৯ কোটি টাকার** বৃত্তি দেওয়া হয়েছে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রের তরুণ শিল্পীদের
- **১৬.৩২ লক্ষ** দেওয়া হয়েছে ব্যারাকপুরের গান্ধী স্মারক সংগ্রহালয়-এর উন্নতিসাধনে

কেন্দ্রের সহায়তা পরিকাঠামো ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের অগ্রগতিতে

- **১৫,৬৭৫ কোটি** টাকা সড়ক পরিকাঠামো প্রকল্পে
- **১৯,৪৮৩ কোটি** টাকা রেলওয়ে পরিকাঠামো উন্নয়নে
- **১৬,৩০০ কোটি** টাকা সাগরমালা প্রকল্পে
- **২৪,০০০ কোটি** টাকার প্রকল্প স্থাপন করেছে প্রতিরক্ষা (পিএসইউ)

হলদিয়ায় মাল্টিমোডাল টার্মিনালের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে

আমাদের সঙ্কল্প
বিকশিত পশ্চিমবঙ্গ
বিকশিত ভারত

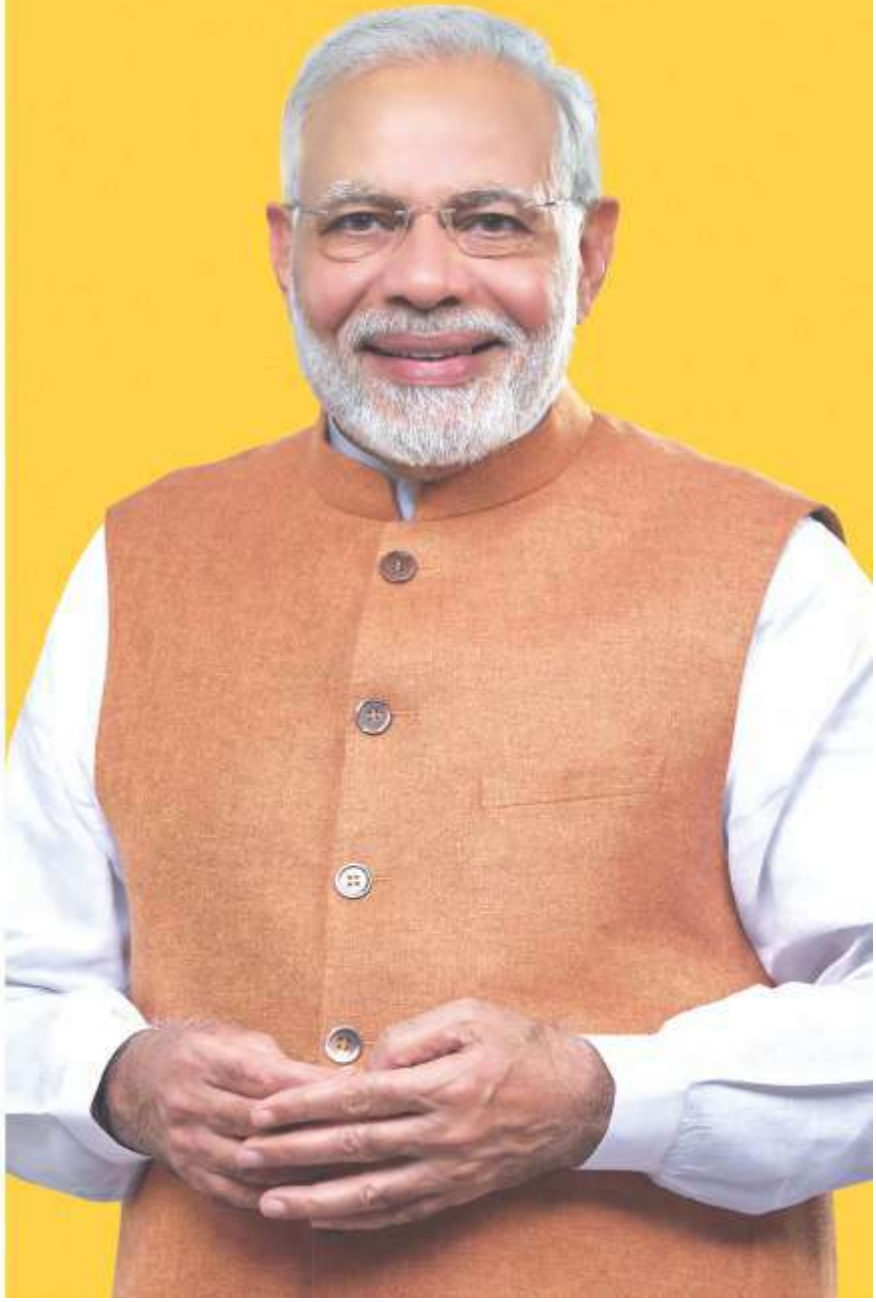

ছবিতে খবর

কলকাতার সায়েন্স সিটি হলে পশ্চিমবঙ্গ বিজেপির বর্ধিত প্রদেশ কার্যকারিণী বৈঠকে কেন্দ্রীয়, রাজ্য এবং জেলা নেতৃত্ব সহ বিজেপি কর্মীবৃন্দ।

কলকাতা ICCR হলে বিজেপির বিস্তারক যোজনা সমারোপ বৈঠকে কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য নেতৃত্ব।

কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিমের দাওয়াত-এ-ইসলাম মন্তব্যের বিরুদ্ধে কলকাতা পুরসভার সামনে কলকাতা উত্তর সাংগঠনিক জেলার বিক্ষোভ কর্মসূচি।

মহামান্য কলকাতা উচ্চ আদালতের নির্দেশে ভোট পরবর্তী হিংসায় আক্রান্ত পরিবারের ৩০০ জনকে নিয়ে রাজভবনের বাইরে ধর্না কর্মসূচিতে উপস্থিত বিজেপি রাজ্য নেতৃত্ব এবং কর্মীবৃন্দ।

পশ্চিমবঙ্গের সৃষ্টিকর্তা ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির জন্মদিবস উপলক্ষে কলকাতা রেড রোডে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানালেন রাজ্য বিজেপি সাংগঠনিক সাধারণ সম্পাদক অমিতাভ চক্রবর্তী ও বিজেপি নেতা তাপস রায়।

রাজ্যে মহিলা নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে রাজভবনে মহামহিম রাজ্যপালের সঙ্গে বিজেপি প্রতিনিধি দলের সাক্ষাৎ।

ছবিতে খবর

ভারত কেশরী শ্রদ্ধেয় ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির বলিদান দিবস উপলক্ষ্যে ভারতীয় জনতা পার্টির প্রদেশ কার্যালয় এবং কেওড়াতলা মহাশ্মশানে তাঁর প্রতি রাজ্য নেতৃত্ব এবং কর্মীবৃন্দের শ্রদ্ধাঞ্জলি।

শ্রদ্ধেয় ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির বলিদান দিবস উপলক্ষ্যে শ্রীরামপুর বিজেপি কার্যালয়ে রক্তদান শিবিরে বিরোধী দলনেতা শ্রী শুভেন্দু অধিকারী।

ভারতীয় জনতা পার্টি বিস্তারক যোজনা সমারোপ বৈঠকে বক্তব্য রাখছেন রাজ্য বিজেপি সাংগঠনিক সাধারণ সম্পাদক অমিতাভ চক্রবর্তী।

কামারহাটি বিধানসভায় আইন-শৃঙ্খলা অবনতি এবং নারী নির্যাতনের প্রতিবাদে রাজ্য বিজেপি মহিলা মোর্চার প্রতিবাদ মিছিল।

কলকাতায় কেন্দ্রীয় কয়লা মন্ত্রী জি কিষাণ রেড্ডিকে দলের তরফে স্বাগত জানালেন রাজ্য বিজেপি সাধারণ সম্পাদক জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়। জানানো হল বেআইনি খনন থেকে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি সহ খনি এলাকার বিবিধ বিষয়ে।

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় প্রাক্তন বিধায়ক এবং পশ্চিমবঙ্গ বিজেপির প্রথম রাজ্যসভাপতি শ্রদ্ধেয় হরিপদ ভারতীর ১০৫ তম জন্মজয়ন্তীতে উপলক্ষ্যে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী সহ অন্যান্য বিধায়কগণ।

বিজেপির কোচবিহার জেলার প্রাক্তন জেলা সভাপতি শ্রী হরিপদ পাল মহাশয়কে গুরু পূর্ণিমার পুণ্য তিথিতে শ্রদ্ধা জানালেন রাজ্য বিজেপি সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) অমিতাভ চক্রবর্তী।

বিজেপি হাওড়া (গ্রামীণ) সাংগঠনিক জেলার বর্ধিত জেলা কার্যকারিণী বৈঠকে বিজেপি রাজ্য সভাপতি ডঃ সুকান্ত মজুমদার এবং জেলা নেতৃত্ব।

গুরুপূর্নিমার পুণ্য প্রভাতে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের শ্রদ্ধেয় স্বামী সুবীরানন্দ মহারাজ এবং স্বামী গৌতমানন্দ মহারাজের দিব্য সান্নিধ্যে বেলুড় মঠে কেন্দ্রীয় শিক্ষা ও উত্তর পূর্ব অঞ্চল উন্নয়নের প্রতিমন্ত্রী তথা রাজ্য সভাপতি ডঃ সুকান্ত মজুমদার।

ছবিতে খবর

জম্মু-কাশ্মীরে স্পেশ্যাল অপারেশনে জঙ্গিদের সঙ্গে লড়াইয়ে শহীদ শিলিগুড়ির বাসিন্দা ক্যাপ্টেন ব্রিজেশ থাপা।
তাঁকে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানিয়ে পরিবারের সাথে দেখা করেন দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্তা।

হুগলী জেলার শ্রীরামপুর লোকসভার কার্যকর্তা সম্মেলনে কেন্দ্রীয় শিক্ষা ও উত্তর পূর্ব অঞ্চল
উন্নয়নের প্রতিমন্ত্রী এবং বিজেপি রাজ্য সভাপতি ডঃ সুকান্ত মজুমদার।

নন্দীগ্রামের হরিপুর ৫ নং অঞ্চলে প্রিয়া নগরী সমবায় সমিতির নির্বাচনে ১২ টির মধ্যে ১১ টি আসনে বিজেপির জয়লাভ।
জয়ী প্রার্থীদের গৈরীক অভিনন্দন জানালেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার তপনে শুভ রথযাত্রায় কেন্দ্রীয় শিক্ষা ও উত্তর পূর্ব অঞ্চল উন্নয়নের প্রতিমন্ত্রী এবং রাজ্য সভাপতি ডঃ সুকান্ত মজুমদার।

বাংলায় তৃণমূলের নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে কলকাতার রাজপথে বিজেপি মহিলা মোর্চার প্রতিবাদী মিছিল।

জয়পুর বিধানসভায় কার্যকর্তাদের সাথে বৈঠকে সাংসদ জ্যোতির্ময় সিং মাহাতো।

দক্ষিণ আসানসোলের ২নং মণ্ডলে সাধারণ সাংগঠনিক সভায় বিজেপি নেত্রী অগ্নিমিত্রা পাল।

আলিপুরদুয়ার সাংগঠনিক জেলায় বর্ধিত জেলা কার্যকারিনী বৈঠকে সাংসদ মনোজ টিগ্গা, রাজ্য সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) শ্রী অমিতাভ চক্রবর্তী সহ জেলা নেতৃত্ব এবং কর্মীবৃন্দ।

আক্রান্ত বাংলার মায়েরা। প্রতিবাদে বাঁকুড়া সদর থানায় বিজেপি মহিলা মোর্চার ডেপুটেশন।

একজন আদর্শ শিক্ষাবিদ

ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

অয়ন বন্দ্যোপাধ্যায়

পারিবারিক ঐতিহ্য শিক্ষা ও আইন ব্যবসা ছেড়ে কেন রাজনীতিতে এলেন- একথা কেউ তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে শ্যামাপ্রসাদ গম্ভীর হয়ে বলতেন- "কি করব বল- বাবা আমার ভাত মেরে গেছেন। তাঁর আদর্শ রক্ষা করতে গিয়ে বাংলায় এম.এ. পাশ করেছি। কিন্তু বাংলায় এমএ-কে চাকরি দেবে কে? তাই তো রাজনীতিতে এসেছি অন্নসংস্থানের আশায়,"- বলেই উচ্চরোলে হাসি।

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের পুত্র শ্যামাপ্রসাদ কম বয়স থেকেই মেধাবী ছাত্র ছিলেন। তিনি ভবানীপুর মিত্র ইন্সটিটিউশন থেকে সরকারী বৃত্তিসহ প্রথম শ্রেণীতে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় পাশ করেন ১৯১৭-এ। ১৯১৯-এ আই.এ. পরীক্ষায় তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেন। এরপর প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হয়ে ইংরাজি সাহিত্যে অনার্স-সহ প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে বি.এ. পাশ করেন ১৯২১ সালে। আই.এ. ও বি.এ. দুই পরীক্ষাতেই বাংলাতেও প্রথম হয়ে বঙ্কিমচন্দ্র রৌপ্য ও স্বর্ণ পদক পারিতোষিক লাভ করেন। এরপর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বঙ্গভাষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে এম.এ. পাশ করেন ১৯২৩-এ। বাংলা সাহিত্যের প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগ ছিল। ১৯২২ খ্রীস্টাব্দে বড়দা রমাপ্রসাদ ও শ্যামাপ্রসাদ দু'জনের উৎসাহে বাড়ি থেকে মাসিক 'বঙ্গবাণী' সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশ শুরু হয়। এই পত্রিকাতেই শ্যামাপ্রসাদ সাহস করে প্রথম শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'পথের দাবী' উপন্যাসটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করতে থাকেন। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন কলেজ থেকে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান লাভ করে বি.এল. পাশ করেন এবং কলকাতা হাইকোর্টের এডভোকেট হন। ১৯২৬-এ তিনি বিলাতে গিয়ে ব্যারিস্টারি পড়তে যান এবং সাফল্যের সঙ্গে ব্যারিস্টারি পাশ করে পরের বছরই ফিরে আসেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, সারা ভারতে স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের ঐকান্তিক চেষ্টার ফলেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বপ্রথম মাতৃভাষায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রি লাভের ব্যবস্থা করে। এই যুগান্তকারী বিধানকে স্বাগত না জানিয়ে শিক্ষিত সমাজের একাংশ বাংলা ভাষায় এম.এ. পাশদের নিয়ে নানা রঙ্গব্যঙ্গ কার্টুন প্রকাশ করতে থাকে পত্রপত্রিকায়। নিজ মাতৃভাষার গৌরবে গৌরবান্বিত না হয়ে তাকে হেয় করার মনোবৃত্তিতে আশুতোষ দুঃখিত হলেন; কিন্তু দমলেন না। বাংলা বিষয়ের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য তাঁর মধ্যমপুত্র ইংরেজী ভাষায় বি.এ. অনার্সে সর্বোচ্চ স্থানাধিকারী শ্যামাপ্রসাদকে বাংলা এম.এ. ক্লাসে ভর্তি করে দিলেন। এ থেকে বোঝা যায় যে, তিনি 'আপনি আচরি ধর্ম পরেরে শিখায়' নীতি পুরোপুরি মেনে চলতেন। বর্তমান নিকট অতীতের কিছু রাজনৈতিক নেতা যেমন 'ইংরেজী হঠাও' বলে নিজ পুত্র-পৌত্রকে ইংরেজী মাধ্যম স্কুলে প্রেরণ করতেন- সেরকম কাজ আশুতোষ করেন নি। পারিবারিক ঐতিহ্য শিক্ষা ও আইন ব্যবসা ছেড়ে কেন রাজনীতিতে এলেন- পরবর্তীকালে একথা কেউ তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে শ্যামাপ্রসাদ গম্ভীর হয়ে বলতেন- "কি করব বল- বাবা আমার ভাত মেরে গেছেন। তাঁর আদর্শ রক্ষা করতে গিয়ে বাংলায় এম.এ. পাশ করেছি। কিন্তু বাংলায় এমএ-কে চাকরি দেবে কে? তাই তো রাজনীতিতে এসেছি অন্ন সংস্থানের আশায়। "- বলেই উচ্চরোলে হাসি।

বিশ্বভারতীর সমাবর্তনে শ্যামাপ্রসাদ, ডিসেম্বর ১৯৫০

শ্যামাপ্রসাদ ১৯২৪-এ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ফেলো' নির্বাচিত হন। এই বছরই মে মাসে স্যর আশুতোষের মৃত্যুর পর সিন্ডিকেটের শূন্য আসনে সদস্যরূপে মনোনীত হন। ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে লন্ডনে ব্যারিস্টারি পড়ার সময় তিনি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সম্মেলনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিত্ব করেন। ১৯৩৪-এ মাত্র ৩৩ বছর বয়সে স্যার আশুতোষের মৃত্যুর (১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে) প্রায়

দশ বছর পর তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসাবে মনোনীত হন। ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত টানা চার বছর তিনি ছিলেন তৎকালীন ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠতম এবং বিশ্বের অন্যতম সেরা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি পিতা আশুতোষের শিক্ষা সংক্রান্ত আদর্শ ও লক্ষ্যগুলি কার্যে পরিণত করতে শুরু করেন। বিজ্ঞান-সাধক আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় শ্যামাপ্রসাদের কাছে লেখা এক পত্রে বলেন, "বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ কাজে তুমি দেখিতেছি 'বাপকা বেটা' হইয়াছ। কেননা এত অক্লান্ত পরিশ্রম ও স্বার্থত্যাগ কেহই করিতে রাজী নয়।"

বিশ্বভারতীর সমাবর্তন অনুষ্ঠানে ভাষণ দিচ্ছেন শ্যামাপ্রসাদ, ১৯৫০

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসাবে শ্যামাপ্রসাদ ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে সমাবর্তন উৎসবে ভাষণ দান করার জন্য অনুরোধ জানান। এই সমাবর্তন উৎসবে রবীন্দ্রনাথ প্রথা ভঙ্গ করে বাংলায় তাঁর বিখ্যাত ভাষণ দেন। উচ্চশিক্ষা প্রসারে শ্যামাপ্রসাদ মাতৃভাষাকে যথাযথ মর্যাদা দেওয়ার পক্ষপাতি ছিলেন। অল্পকালের মধ্যেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসাবে তাঁর নাম সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়ে। তিনি আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় বোর্ডের সদস্য ও পরে চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় ভাষণ দেওয়ার জন্য ও কমিটির সদস্য হওয়ার জন্য তাঁর কাছে অনুরোধ আসতে থাকে। ১৯৩৫-এ শ্যামাপ্রসাদ ব্যাঙ্গালোরে ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অফ সায়েন্সের কোর্ট ও কাউন্সিলের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৩৮ খ্রিষ্টাব্দে তিনি সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ইন্টেলেকচুয়াল কো-অপারেশন কমিটিতে ভারতের প্রতিনিধি মনোনীত হন। প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ অধ্যাপক নিখিলেশ গুহ লিখেছেন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসাবে শ্যামাপ্রসাদের অন্যতম কৃতিত্ব হল- ১।কৃষিশিক্ষার ব্যবস্থা, ২। বিহারীলাল মিত্রের অর্থানুকূল্যে মেয়েদের জন্য হোম সায়েন্স কলেজ প্রতিষ্ঠা ও হোম সায়েন্স শিক্ষার ব্যবস্থা, ৩। আশুতোষ মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠা এবং ৪। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে সামনে রেখে বাংলা বানানের সমতা এবং বাংলায় বৈজ্ঞানিক পরিভাষা প্রণয়ন। শেষোক্ত লক্ষ্যে দুটি কমিটিও গঠন করা হয়েছিল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন সহ-রেজিষ্ট্রার ডঃ দীনেশচন্দ্র সিংহ-র মতে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসাবে শ্যামাপ্রসাদের ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলি হল - বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা দিবস সাড়ম্বরে উদযাপন, বাংলা বানান সংস্কার, বাংলা পরিভাষা সমিতি গঠন, রবীন্দ্রনাথকে বাংলা ভাষায় সমাবর্তন ভাষণদানে আহ্বান, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতীক চিহ্নের পরিবর্তন ইত্যাদি।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রথম মৃত্যুবার্ষিকীতে দেবানন্দপুরে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি, ১৯৩৮

শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ইচ্ছা ছিল কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে অধিক পরিমাণে যুক্ত করার। আশুতোষের অনুরোধে কবি ইতিপূর্বে ১৯০৬ খ্রিষ্টাব্দে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক স্তরে বাংলার প্রশ্নপত্র রচনা করেছিলেন। কবির নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির সংবাদ প্রকাশের পূর্বেই বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে তাঁকে সাম্মানিক ডক্টর অফ লিটারেচার উপাধিতে ভূষিত করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়েছিল। ১৯৩৭ খ্রিষ্টাব্দে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচলিত রীতি

লঙ্ঘন করে শ্যামাপ্রসাদের অনুরোধে রবীন্দ্রনাথ ইংরেজির বদলে বাংলায় ভাষণ দিতে গিয়ে সেই কথা স্মরণ করে বলেন- "বিশ্ববিদ্যালয়ের দীক্ষামন্ত্র থেকে বঞ্চিত আমার মত ব্রাত্য বাংলা লেখককে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি দিয়ে আশুতোষ প্রথম রীতি লঙ্ঘন করেছেন; আজ তাঁরই পুত্র সেই ব্রাত্যকেই আজকের দিনের অনুষ্ঠানে বাংলা ভাষায় অভিভাষণ পাঠ করতে নিমন্ত্রণ করে পুনশ্চ সেই রীতিরই দুটি গ্রন্থি একসঙ্গে যুক্ত করেছেন। এতে বোঝা গেল বাংলাদেশে শিক্ষাক্ষেত্রে ঋতু পরিবর্তন হয়েছে, পাশ্চাত্ত্য আবহাওয়ায় শীতে আড়ষ্ট শাখায় আজ এল নবপল্লব উৎসব। " কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন সহ-রেজিষ্ট্রার ডঃ দীনেশচন্দ্র সিংহ তাঁর শ্যামাপ্রসাদঃ বঙ্গবিভাগ ও পশ্চিমবঙ্গ গ্রন্থে (পৃষ্ঠা-৫১) লিখেছেন, "মুসলমান ছাত্ররা সেই সমাবর্তন বয়কট করে কবির প্রতি অসৌজন্য প্রকাশেও পিছপা হয় নি।''

মুসলিম লিগ সরকারের সেকেন্ডারি এডুকেশন বিলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সভায় শ্যামাপ্রসাদ তাঁর পাশে (বাঁদিক থেকে) বসে আছেন প্রফুল্ল চন্দ্র রায়, মন্মথ নাথ মুখার্জি এবং নির্মল চন্দ্র চ্যাটার্জি

কলকাতা ও ভারতের অন্যান্য উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে শ্যামাপ্রসাদ যে সুচিন্তিত ও মূল্যবান বক্তৃতাগুলি দেন তা থেকেই তাঁর শিক্ষানীতি সম্পর্কে বোঝা যায়। তিনি সকলের জন্য উচ্চশিক্ষার দরজা উন্মুক্ত করার পক্ষপাতী ছিলেন। উচ্চশিক্ষা ছাড়া যে মনুষ্যত্বের চরম বিকাশ সম্ভব নয়- এ বিষয়ে তাঁর দৃঢ় প্রত্যয় ছিল। জাতীয় উন্নয়নে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে- এ কথা তিনি বহু বক্তৃতায় উল্লেখ করেছেন। ছাত্রদের নৈতিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের দৈহিক শক্তি বৃদ্ধির প্রয়োজনের কথা শ্যামাপ্রসাদ বলেন ১৯৩৫-এ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন ভাষণে- "আমাদের দেশের শিক্ষিত যুবকেরা যদি দৈহিক শক্তিতে দুর্বল হয় এবং আধুনিক জীবনের আনুষঙ্গিক চাপ সহ্য করিতে অশক্ত ও তাহার জন্য প্রয়োজনীয় শ্রম করিতে অসমর্থ হয়, তো শিক্ষার কি মূল্য থাকিতে পারে? আমরা যাহাদের মানসিক উৎকর্ষ সাধনের চেষ্টা করিতেছি তাহাদের জন্য সুস্থ ও সবল করিয়া গড়িয়া তুলিতে না পারি তাহা হইলে এই শিক্ষাদান ব্যর্থ হইয়া যাইবে। শুধু শারীরিক উন্নতি অথবা অভাবী ধী-সম্পন্ন ছাত্রদের সাহায্য করিলেই কর্তব্য শেষ হইবে না। ছাত্রদের নৈতিক চরিত্র যাতে উন্নত হয় সেদিকেও লক্ষ্য রাখিতে হইবে। এমন একদম নর-নারী সৃষ্টি করিতে হইবে যাহারা গৃহের, গ্রামের ও শহরের এমনকি সরকার, স্থানীয় শাসন ও জাতীয় পরিকল্পনার উপর স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিতে পারিবে- যাহারা ন্যায়পথ অনুসরণ করিয়া ভয়শূন্য চিত্তে জনকল্যাণ মহাব্রতের উৎযাপনের জন্য কার্য করিয়া যাইবে।''

উচ্চশিক্ষা ছাড়াও প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার গুরুত্বের কথাও তিনি বলেছিলেন। বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে তিনি বলেন- একথা আমরা যেন ভুলে না যাই যে পৃথিবীর সমস্ত সভ্য দেশেই প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক। যেখানে এই শিক্ষা বিনা বেতনে বিতরণ করা হয় সেই সকল দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিরাও অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, প্রাথমিক শিক্ষার পরিণতি হিসাবে উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা করতে না পারলে ঐ শিক্ষা যে শুধু ব্যর্থ হয় তাই-ই নয়, তা রীতিমত বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়ায়।

১৯৩৫ সালে নাগপুরে অনুষ্ঠিত সর্বভারতীয় শিক্ষা সম্মেলনে সভাপতির ভাষণে শ্যামাপ্রসাদ বলেছিলেন যে, ভারতের দেশীয় ভাষাগুলিকে উন্নত করতে হবে এবং জাতীয় শিক্ষানীতিতে তাদের যথাযোগ্য মর্যাদা দিতে হবে। ১৯৪৩-এ গুরুকুল বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন ভাষণে তিনি বলেন, "পাশ্চাত্য জ্ঞানভাণ্ডারের সিংহদ্বার আমাদের সামনে উন্মুক্ত করা হয়েছে বলে আমদের দুঃখ নেই। পরিতাপের বিষয় এই যে, এর জন্য আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে বলি দেওয়া হয়েছে।''

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকতার প্রতীক কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতীক চিহ্নটি ('C r e s t ') পরিবর্তন করার ব্যাপারে বেশ কিছুকাল ধরেই আলাপ-আলোচনা চলছিল। অনেক কমিটি, মিটিং, বৈঠক ও বিশেষজ্ঞদের মতামত জানার পর প্রস্ফুটিত পদ্মফুলের ওপর বাংলায় 'শ্রী' অক্ষর শোভিত প্রতীক চিহ্নটি গৃহীত ও প্রচলিত হয়। ১৯৩৭-এ অখণ্ড বঙ্গে মুসলিম লীগের সরকার গঠিত হয়। তারা এই 'শ্রী' ও 'পদ্ম'-কে ইসলাম-বিরোধী বলে অভিহিত করে। ফলে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতীক চিহ্ন থেকে শ্রী ও পদ্ম সরিয়ে দেওয়া হয়। ১৯৩৮-এর অগাস্ট মাসে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের উপাচার্য পদের মেয়াদ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই লীগ সাফল্যের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় চালান সত্ত্বেও তাঁকেই পুনঃনিয়োগ না করে শিক্ষার ব্যাপারে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ এক মুসলিম উপাচার্য নিয়োগ করে। ফলে প্রশাসন ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গের শিক্ষা ব্যবস্থারও ইসলামীকরণ শুরু হয়। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মত একজন আদ্যান্ত শিক্ষাবিদও অনুভব করেন যে বাঙ্গালী হিন্দুর অস্তিত্ব সংকটে এবং মূলত বাঙ্গালী হিন্দুর স্বার্থ রক্ষা আরও নির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে অস্তিত্বরক্ষার জন্যই তিনি রাজনীতিতে প্রবেশের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং হিন্দু মহাসভায় যোগদান করেন।

সরকারি কর্মীদের আরএসএস করতে রইল না বাধা

কংগ্রেস-আমলের আদেশনামা বাতিল কেন্দ্রের

শুভ্র চট্টোপাধ্যায়

১৯৬৬ সালে অসাংবিধানিকভাবে এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যে সরকারি কর্মচারীরা আরএসএসে যোগ দিতে পারবেন না। সেই নির্দেশ প্রত্যাহার করেছে মোদি সরকার। আরএসএসের দাপটে আতঙ্কিত হয়ে এই নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিলেন ইন্দিরা গান্ধী। গান্ধী-নেহরু পরিবারের বুঝতে বিন্দুমাত্র ভুল হয়নি যে অদূর ভবিষ্যতে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘই কংগ্রেসের পরিবারতন্ত্রকে চ্যালেঞ্জ জানাতে পারে।

সরকারি কর্মীরা আরএসএস করতে পারবেন না, এই বিষয়ে ৫৮ বছর আগে ১৯৬৬ সালে আদেশনামা জারি করেছিল কংগ্রেস সরকার। অবশেষে সেই নির্দেশকে তুলে দিল মোদি সরকার। জানা গিয়েছে, এর আগে ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কাছে গত ২০১৮ সালেই আবেদন করেছিল যে সরকার যেন বিষয়টি ফের বিবেচনা করে। প্রধানমন্ত্রীর কাছে আবেদন করে বলা হয়েছিল যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রক যেন আগের সরকারি নির্দেশ প্রত্যাহার করে নেয়। কারণ সরকারি চাকরিরতরাও চান যাতে তাঁরাও দেশ গঠনের কাজে অংশ নিতে পারেন। প্রসঙ্গত, স্বয়ংসেবক হওয়ার অপরাধে রোষানলেও পড়তে হয় সরকারি কর্মীদের। আরএসএসে যোগ দেওয়ার অভিযোগে ১৯৬৫ সালে শ্রী রামপাল নামে এক ব্যক্তির চাকরি বাতিল করার নির্দেশ দেয় পাঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্ট। সেই সময় ওই স্বয়ংসেবক দাবি করেছিলেন, আরএসএস কোনও রাজনৈতিক দল নয়, ফলে এতে কোনও নিয়ম লঙ্ঘিত হয়নি। আদালতের সেই নির্দেশকে রামপাল চ্যালেঞ্জ করেন। সেই সময় হাইকোর্ট মেনে নেয় যে আরএসএসকে রাজনৈতিক দল বলার মতো কোনও প্রমাণ নেই।

কী বলছেন আরএসএস-এর সর্বভারতীয় প্রচার প্রমুখ সুনীল আম্বেকর

আরএসএস-এর সর্বভারতীয় প্রচার প্রমুখ সুনীল আম্বেকর এই প্রসঙ্গে বলেছেন, "শুধুমাত্র রাজনৈতিক স্বার্থে আগের সরকার সঙ্ঘের মতো একটি গঠনমূলক সংগঠনের কর্মকাণ্ডে অংশ নিতে নিষেধ করেছিল সরকারি কর্মীদের। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ গত ৯৯ বছর ধরে জাতির পুনর্গঠনে এবং সমাজের সেবায় নিযুক্ত রয়েছে।" সুনীল আম্বেকর আরও উল্লেখ করেন, "জাতীয় সুরক্ষা, ঐক্যের

ক্ষেত্রে অথবা প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় সাহায্য করার জন্য বারবার প্রশংসিত হয়েছে আরএসএস।"

১৯৬৬ সালে কংগ্রেসের সরকারের আদেশনামা

প্রসঙ্গত ১৯৬৬ সালের ৩০ নভেম্বর কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীরা যাতে আরএসএসের সঙ্গে যুক্ত হতে না পারেন, সেই নির্দেশ দিয়েছিল কংগ্রেস সরকার। এমনকি সেই সময় আরএসএসের সঙ্গে মিটিং করা ও এমন ধরনের মিটিংয়ে অংশ নেওয়ার ক্ষেত্রেও নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছিল। যে কোনও ধরনের আরএসএস-এর সংস্পর্শে না যাওয়ার ক্ষেত্রে আদেশ জারি করেছিল কংগ্রেস সরকার। পরে জনতা সরকারের আমলে এই নিষিদ্ধকরণ সাময়িকভাবে তোলা হয়েছিল। ফের ১৯৮০ সালে কেন্দ্রীয় সরকার এই নির্দেশ পুনরায় লাগু করে। ২০০০ সালে গুজরাটের বিজেপি সরকার এই নিষেধাজ্ঞা তুলেছিল। সেসময় গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন কেশুভাই প্যাটেল।

যথার্থ বলেছেন অমিত মালব্য

এ প্রসঙ্গে সমাজমাধ্যমে বিজেপি নেতা অমিত মালব্য লেখেন, "১৯৬৬ সালে অসাংবিধানিকভাবে এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যে সরকারি কর্মচারীরা আরএসএসে যোগ দিতে পারবেন না। সেই নির্দেশ প্রত্যাহার করেছে মোদি সরকার। এমন আইন পাশ করাই উচিত ছিল না। আসলে আরএসএসের দাপটে আতঙ্কিত হয়ে পড়ে এই নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিলেন ইন্দিরা গান্ধী," অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কথা লিখেছেন অমিত মালব্য। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের দাপটে আতঙ্কিত হয়ে পড়ে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিলেন ইন্দিরা গান্ধী। আসলে গান্ধী-নেহরু পরিবার ক্ষমতার অলিন্দে থেকে কখনও ভাবতে পারেনি যে তাঁদের পরিবারতন্ত্রকে কেউ চ্যালেঞ্জ করতে পারে। কিন্তু সে সময়ে দেশজুড়ে বিস্তার লাভ করতে থাকে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ। গান্ধী-নেহরু পরিবারের ইন্দিরা দেবীর বুঝতে বিন্দুমাত্র ভুল হয়নি যে অদূর ভবিষ্যতে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘই এই পরিবারতন্ত্রকে চ্যালেঞ্জ জানাতে পারে। তাই সেই মতো তিনি সরকারি কর্মীদের আরএসএস-এ যোগদানে বাধা দেন। ইন্দিরা গান্ধীর এমন আতঙ্ক যে নিছক ভুল ছিল না ৫৮ বছর পরে তা ভারতজুড়ে প্রমাণিত হয়েছে। সঙ্ঘ পরিবারের দাপটের কাছে কার্যত দিশেহারা কংগ্রেস। পরপর তিনটি এমন নির্বাচন গিয়েছে যেখানে কংগ্রেস তিন অঙ্কের গণ্ডি পেরতে পারিনি। অথচ একটা সময় ছিল সারা দেশে যখন কংগ্রেসের শাসন ছাড়া অন্য কিছু ভাবা যেত না। তবে ক্ষমতার সেই হ্যাংওভার কংগ্রেস নেতাদের মধ্যে এখনও দেখা যাচ্ছে। রাহুল গান্ধী দল ৯৯ আসন পেয়ে এমন ঔদ্ধত্য দেখাচ্ছে যা ক্ষমতাসীন দলও তা দেখায় না। আরএসএসের ওপর নিষেধাজ্ঞার এমন আদেশনামা মোদি সরকার তুলে দিতেই রে রে করে মাঠে নেমে পড়েছেন কংগ্রেস নেতারা। জয়রাম রমেশ থেকে অন্যান্য কংগ্রেস নেতারা সমাজ মাধ্যমে মোদি সরকারের সিদ্ধান্তের বিরোধিতায় নেমেছে। পৃথিবীর মধ্যে সবথেকে বড় সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠনে কংগ্রেস সরকার নিষেধাজ্ঞা জারি করতে পারে, অথচ তাদেরই দলের নেতা দিগ্বিজয় সিং ২৬/১১ এর হামলায় আরএসএসের ভূমিকা দেখতে পান, ওসামা বিন লাদেনকে ওসামাজী সম্মোধন করেন। কংগ্রেস নেতা মণি শংকর আইয়ার পাকিস্তানের প্রতি ভারত সরকারকে শ্রদ্ধাশীল হওয়ার পরামর্শ দেন, কেননা পাকিস্তান নাকি পরমাণু শক্তিধর রাষ্ট্র!

সন্ত্রাসবাদীরা কংগ্রেসের কাছে শ্রদ্ধার হয় কিন্তু ভারতীয়ত্ববোধে বিশ্বাস রাখা, জাতীয় ঐক্য এবং অখণ্ডতার স্বার্থে সমাজের কাজ করা, দেশ গঠনে নিরানব্বই বছর ধরে কাজ করা একটা সংগঠনকে আজও নিষিদ্ধ করে রাখতে চায় কংগ্রেস! তাদের নেতাদের এই মানসিকতার প্রতিফলনই বারবার ধরা পড়ছে। গান্ধী হত্যার মিথ্যা দায় কংগ্রেস সঙ্ঘের ওপর চাপাতে চেয়েছিল, কিন্তু তাদের দলের এমন মিথ্যাচার ধোপে টেকেনি। খোদ মহাত্মা গান্ধীও আরএসএস-এর শিবির পরিদর্শন করে মুগ্ধ হয়েছিলেন। সঙ্ঘের শিবির পরিদর্শন করে ভূয়সী প্রশংসা করেন বাবা সাহেব আম্বেদকরও। কংগ্রেসের রাহুল গান্ধীরা কি সেই খবর রাখেন?

মহাত্মা গান্ধীর চোখে সঙ্ঘের শিবির

১৯৩৪ সালে মহাত্মা গান্ধী ওয়ার্ধাতে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের শিবির পরিদর্শন করেন এবং স্বয়ংসেবকদের উদ্দেশ্যে তিনি বক্তব্য রাখেন। পরবর্তীকালে শিবির পরিদর্শনের কথা মহত্মা গান্ধীর বলেন ১৯৪৭ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর দিল্লিতে। তিনি বলেন, "আমি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের শিবির পরিদর্শন করেছিলাম বেশ কয়েক বছর আগে। যখন ডাক্তার কেশব বলিরাম হেডগেওয়ার জীবিত ছিলেন। আমি খুবই আশ্চর্য হয়েছিলাম সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকদের এমন নিয়মানুবর্তিতা, শৃঙ্খলা পরায়ণতা এবং জাতপাতহীন সমাজ ব্যবস্থা দেখে। তারপর থেকে সঙ্ঘের অনেকটা বিকাশ হয়েছে। আমি নিশ্চিত যে সংগঠনে এমন মহান আদর্শ এবং আত্মত্যাগের মন্ত্র রয়েছে তারা শক্তিশালী হবেই।"

বাবা সাহেব আম্বেদকরের চোখে আরএসএস

বাবা সাহেব আম্বেদকর সঙ্ঘের শিবির পরিদর্শন করেন ১৯৪৯ সালে পুণেতে। বাবাসাহেব আম্বেদকর ডাক্তার কেশব বলিরাম হেডগেওয়ারকে জিজ্ঞাসা করেন যে সঙ্ঘের শিবির গুলিতে অস্পৃশ্যতা সংক্রান্ত অসুবিধা রয়েছে নাকি! তখন আরএসএস প্রতিষ্ঠাতা তাঁকে উত্তর দেন, এখানে কোনও অস্পৃশ্যতা নেই। যাঁরা এখানে আসেন তাঁরা প্রত্যেকেই শুধু হিন্দু। প্রত্যুত্তরে আম্বেদকর বলেন, আমি এই শিবির পরিদর্শন করে আশ্চর্য হলাম। স্বয়ংসেবকরা অন্যদের জাতপাত না জেনেও তাঁদের সঙ্গে ভ্রাতৃত্ববোধ নিয়ে চলাফেরা করেন। বিখ্যাত স্বাধীনতা সংগ্রামী জয়প্রকাশ নারায়ণ যিনি সোসালিস্ট ছিলেন এবং সত্তরের দশকে ঐতিহাসিক আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন ইন্দিরা গান্ধী সরকারের বিরুদ্ধে, তিনিও ১৯৭৭ সালের ৩ নভেম্বর পাটনাতে আরএসএস-এর ট্রেনিং ক্যাম্পে সম্মোধন করেন। ২০১৮ সালের জুন মাসে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়ও সঙ্ঘের তৃতীয় বর্ষের ট্রেনিং ক্যাম্পে সম্বোধন করেন।

কেন্দ্রীয় বাজেট ২০২৪

নতুন ভারত নির্মাণের মাইলস্টোন

দিব্যেন্দু দালাল

বিকশিত ভারতের অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন একটি ভবিষ্যতদর্শী বাজেট পেশ করেছেন যা ভারতের আর্থিক সংস্কারকে আরও ত্বরান্বিত করবে। জনমোহিনী সস্তার রাজনৈতিক বাজেট তৈরী না করে তিনি একটি অত্যন্ত সাহসী বাজেট পেশ করেছেন, যেটি নিঃসন্দেহে এক সুদৃঢ় ভারত নির্মাণের মাইলস্টোন।

সংসদে ২০২৪ সালের কেন্দ্রীয় বাজেট পেশ করার সঙ্গে সঙ্গে অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন ইতিহাস গড়লেন। এই প্রথম কোন অর্থমন্ত্রী টানা সাত বছর বাজেট পেশ করার কৃতিত্ব অর্জন করলেন। এর আগে মোরারজী দেশাই টানা পাঁচবার পূর্ণাঙ্গ বাজেট এবং একবার অন্তর্বর্তী বাজেট পেশ করেছিলেন। যাই হোক, এবারের বাজেট এমন একটা সময়ের বাজেট যখন ভারতের অর্থনীতি বিশ্বের সবথেকে প্রতিশ্রুতিপূর্ণ অর্থনীতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ভারতের আর্থিক বৃদ্ধির হার এখন বিশ্বের সর্বোচ্চ। ২০২৩ সালে বাকি বিশ্বের গড় আর্থিক বৃদ্ধির হার যেখানে ৩.২% ছিল ভারতের আর্থিক বৃদ্ধির হার সেখানে ৮% -এর বেশী ছিল। এমতাবস্থায় মূল লক্ষ্য হল আত্মনির্ভরশীল, বিকশিত ভারত নির্মাণ করা যা অমৃতকালের এই সময়ে প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্ন।

গত দশ বছরের নিরন্তর আর্থিক সংস্কারের ফলে ভারতের এই আর্থিক বৃদ্ধি সম্ভব হয়েছে। কোভিড পরবর্তী কালে যেখানে বিশ্বের অধিকাংশ দেশ আর্থিক মন্দা এবং ভয়ঙ্কর মুদ্রাস্ফীতির মধ্যে জর্জরিত হয়ে পড়েছে, ভারতের অর্থনীতি সেখানে সুদৃঢ় ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে আছে। মুদ্রাস্ফীতির হার গত বছরের ৬.৭% থেকে কমে ৫.৪% হয়েছে। মুদ্রাস্ফীতিকে নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব হয়েছে কারণ কোভিড পরবর্তী সময়ের পর থেকে রাজস্ব ঘাটতি ক্রমশই নিম্নমুখী হয়েছে। বর্তমান আর্থিক বছরের ঘাটতি জিডিপির ৪.৯% হয়েছে এবং আগামী আর্থিক বছরে সেটা কমিয়ে জিডিপির ৪.৫% করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে।

নিন্দুকেরা বলতে পারেন যে এই আর্থিক বৃদ্ধির ফলে তো কর্মসংস্থান বৃদ্ধি হয়নি, অর্থাৎ 'Jobless growth' হয়েছে, কিন্তু তথ্য বলছে বিগত ছয় বছরে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি হয়েছে তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে। গত ২০২২-২৩ সালে দেশের বেকারত্ব কমেছে ৩.২%। এমপ্লয়িজ প্রভিডেণ্ড

ফাণ্ড বা EPFO তে নিট সংযুক্তিকরণের সংখ্যা গত পাঁচ বছরে দ্বিগুণ হয়েছে।

এরকম একটা পরিস্থিতিতে অর্থমন্ত্রীর লক্ষ্য ছিল এমন একটা বাজেট পেশ করা যা এই আর্থিক বৃদ্ধির হারকে ত্বরান্বিত করে এবং অবশ্যই সেটা যেন কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধিতে সাহায্য করে।

২০২৪ কেন্দ্রীয় বাজেটের মূল থিম ছিল -

১। কর্মসংস্থান

২। দক্ষতা

৩। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প (MSME)

৪। মধ্যবিত্ত শ্রেণী

৫। বিকশিত ভারতের লক্ষ্যে পদক্ষেপ

৬। কৃষিক্ষেত্রে গবেষণার মাধ্যমে উচ্চ ফলনশীল এবং প্রতিকূল আবহাওয়ার সঙ্গে যুঝতে পারা প্রকরণ তৈরী করার লক্ষ্য।

কর্মসংস্থান বৃদ্ধির লক্ষ্যে সংগঠিত ক্ষেত্রে নতুন চাকুরীপ্রাপ্তদের প্রথম মাসের বেতন (১৫০০০ টাকা) পর্যন্ত সরকার তিনটে কিস্তিতে দেবে। নতুন চাকুরীপ্রাপ্তদের সরকার দুই বছর তাদের EPFO খাতায় সর্বাধিক ৩০০০ টাকা করে প্রতি মাসে জমা করবে। এই ইন্সেন্টিভের ফলে ৫০ লক্ষ কর্মসংস্থান সৃষ্টির সম্ভাবনা তৈরী হবে। এছাড়াও প্রথমবার চাকুরীপ্রাপ্তদের জন্য কর্মী ও নিয়োগকারী উভয়কেই EPFO-তে জমা করার জন্য ইন্সেন্টিভ প্রদান করার যোজনাও গ্রহণ করা হয়েছে। কর্মরতা মহিলাদের জন্য ইন্ডাস্ট্রির সহায়তায় হস্টেল ও ক্রেশ তৈরীর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ৫ বছরে ২০ লক্ষ যুবাদের কর্মদক্ষ করার ব্যবস্থা নেওয়ার মাধ্যমে দক্ষ শ্রম গড়ে তোলা হবে যাতে উৎপাদন শিল্পে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি সহজে হয়। ১০০০ আইটিআইকে আপগ্রেড করা হবে। ইন্ডাস্ট্রির চাহিদা অনুযায়ী পাঠ্যক্রমকে তৈরী করা হবে। ছাত্রদের ৭.৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ সরকারের উন্নীত ফাণ্ডের গ্যারান্টিসহ দেওয়া হবে যা প্রায় ২৫ হাজার ছাত্রদের উপকার করবে। ই-ভাউচারের মাধ্যমে ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ নেওয়া ছাত্রদের ঋণের সুদের ওপর ৩ % সহায়তা করা হবে যা প্রতি বছর প্রায় ১ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রীদের সুবিধা দেবে।

বিকশিত ভারতের লক্ষ্যে অগ্রাধিকার যারা পাবে

পূর্বোদয় যোজনার মাধ্যমে পূর্বভারতের বিহার, ঝাড়খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা ও অন্ধ্রপ্রদেশে আর্থিক সুযোগ তৈরী করার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। অমৃতসর-কলকাতা ইন্ডাস্ট্রিয়াল করিডোর এবং গয়ায় ইন্ডাস্ট্রিয়াল নোডের ব্যবস্থা করা হবে। মহিলা এবং মেয়েদের কল্যাণকারী প্রকল্পগুলির জন্য ৩ লক্ষ কোটি টাকা ধার্য করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী জনজাতীয় উন্নত গ্রাম অভিযান যোজনায় ৬৩,০০০ গ্রামের ৫ কোটি জনজাতির মানুষদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ব্যবস্থা করা হবে। এছাড়াও অন্ধ্রপ্রদেশের জন্য পরিকাঠামোগত উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৫,০০০ কোটি টাকার সহায়তা প্রদান করা হবে।

উৎপাদন ও পরিষেবা ক্ষেত্র

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের উৎপাদনকারী সংস্থার জন্য ক্রেডিট গ্যারান্টি প্রকল্প, ক্রেডিট অ্যাসেসমেন্টের জন্য ব্যাঙ্কের নিজস্ব মূল্যায়নের ব্যবস্থা, 'তরুণ' বিভাগে মুদ্রা ঋণ ১০ লক্ষ থেকে বাড়িয়ে ২০ লক্ষ করা, কঠিন সময়ের জন্য ঋণের সহায়তার মাধ্যমে MSME ক্ষেত্র যেখানে ভারতের সর্বাধিক মানুষ কর্মরত থাকেন তাকে বিশেষ অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও আগামী ৫ বছরে ১ কোটি যুবাদের ৫০০টি সংস্থায় শিক্ষানবিসীর ব্যবস্থার যোজনা গ্রহণ করা হয়েছে। এরা মাসিক ৫০০০ টাকার ভাতাও পাবে।

নগর উন্নয়নের প্রচেষ্টা

বাছাই করা কিছু শহরে স্ট্রিট ফুড হাব তৈরী হবে। দেশের ১৪টি বড় শহর যেখানে জনসংখ্যা ৩০ লক্ষের বেশী সেখানে পরিবহন সংক্রান্ত উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হবে যাতে সেখানকার নাগরিকদের যাতায়াত আরামদায়ক ও সুবিধাজনক হয়। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা ২.০ -এর আওতায় দেশের ১ কোটি দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত মানুষের

বাসস্থানের জন্য ১০ লক্ষ কোটি টাকার বিনিয়োগ হবে। এছাড়াও জল সরবরাহ, বর্জ্যের জন্য waste management project ১০০ টি শহরে রূপায়ন করার যোজনা গ্রহণ করা হয়েছে।

শক্তির সুরক্ষা

বেসরকারী সংস্থার সঙ্গে হাত মিলিয়ে পারমাণবিক শক্তি ক্ষেত্রে ভারত স্মল রিয়াক্টর নির্মাণ এবং

গবেষণার মাধ্যমে ভারত স্মল মডিউলার রিয়াক্টর ও পারমাণবিক শক্তির ক্ষেত্রে প্রযুক্তির প্রয়োগ। এনটিপিসি ও ভেল (BHEL) -এর যৌথ উদ্যোগে দেশে প্রথম ৮০০ মেগাওয়াটের বাণিজ্যিক প্ল্যান্ট তৈরী হবে। MSME ইন্ডাস্ট্রির ক্ষেত্রে কম ক্ষতিকর শক্তির ব্যবহারের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হবে, যা পরিবেশের সংরক্ষণের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

পরিকাঠামোগত উন্নয়ন

এই বাজেটে পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য গত বাজেটের তুলনায় বিনিয়োগ আরও বৃদ্ধি করা হয়েছে। এই বাজেটের মাধ্যমে মোট ১১,১১,১১১ কোটি টাকা (জিডিপির ৩.৪%) পরিকাঠামো ক্ষেত্রে ধার্য করা হয়েছে যা এখনও পর্যন্ত সর্বাধিক। পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য রাজ্যগুলিকে ১.৫ লক্ষ কোটি টাকা সুদ বিহীন ঋণ প্রদান করা হবে। প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনার চতুর্থ দফার মাধ্যমে ২৫,০০০ বসতিকে সব আবহাওয়ার সহনীয় যোগাযোগ ব্যবস্থা তৈরী করা হবে। অসম, সিকিম ও উত্তরাখণ্ডে বন্যা মোকাবিলার জন্য Flood management project-এ সহায়তা প্রদান করা হবে। হিমাচল প্রদেশে পুনর্গঠন ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হবে।

কাশী বিশ্বনাথ মন্দির করিডোরের আদলে বিষ্ণুপদ মন্দির করিডোর ও মহাবোধি মন্দির করিডোরের নির্মাণ হবে। এছাড়াও ওড়িশা ও নালন্দায় পর্যটন বৃদ্ধির স্বার্থে পরিকাঠামোগত উন্নয়নমূলক যোজনা গ্রহণ করা হবে।

এ তো গেল খরচার দিক। ব্যয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আয়ের পথ না তৈরী হলে বাজেটে ঘাটতি দেখা যায় তা বলাই বাহুল্য। তাই ভারসাম্য বজায় রাখতে সরকার করের মাধ্যমে আয়ের পথটা খুঁজে নেয়। তবে এই বাজেটে করের ক্ষেত্রেও কিছু উল্লেখযোগ্য ছাড় বা রেহাই দেওয়া হয়েছে।

প্রত্যক্ষ কর

ফাইন্যানশিয়াল অ্যাসেটের ক্ষেত্রে ক্যাপিটাল গেন ট্যাক্সের ক্ষেত্রে ছাড়ের ঊর্ধ্বসীমা বাড়িয়ে বছরে ১.২৫ লক্ষ টাকা করা হয়েছে। এঞ্জেল ট্যাক্সকে খতম করা হয়েছে যা স্টার্টআপ সংস্থাগুলিকে বিশেষ ভাবে সুবিধা দেবে। বিদেশী সংস্থার ক্ষেত্রে কর্পোরেট ট্যাক্স ৪০% থেকে কমিয়ে ৩৫% করা হয়েছে যা বিদেশী বিনিয়োগের রাস্তা সুগম করবে।

আয়করের ক্ষেত্রে নতুন কর ব্যবস্থায় বেশ কিছুটা রদবদল করে করের হারে কিছুটা রেহাই দেওয়া হয়েছে। যেমন, এখন বছরে ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয়ের ক্ষেত্রে ১০% কর দিতে হবে। আগে এটা ৯ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ছিল। এছাড়া স্টাণ্ডার্ড ডিডাকশনকে আগের ৫০,০০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৭৫,০০০ টাকা করা হয়েছে। এখন বছরে ১৭,০০০ টাকা পর্যন্ত জমানো যাবে।

সব মিলিয়ে দেখতে গেলে এটা বলা যায় যে এই মুহূর্তে ভারতের যা পরিস্থিতি সেখানে দাঁড়িয়ে ভারতের অর্থমন্ত্রী একটি ভবিষ্যতদর্শী বাজেট পেশ করেছেন যা ভারতের আর্থিক সংস্কারকে আরও ত্বরান্বিত করবে। জনমোহিনী সস্তার রাজনৈতিক বাজেট তৈরী না করে তিনি একটি অত্যন্ত সাহসী বাজেট পেশ করেছেন, যেটি নিঃসন্দেহে এক সুদৃঢ় ভারত তৈরী করবে।

বাংলাদেশের সংরক্ষণ বিরোধী আন্দোলন ও ভারত

বিনয়ভূষণ দাশ

বাংলাদেশে মুক্তিযোদ্ধাদের পরিবারের জন্য সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা আছে কি নেই সেই বিতর্কে আমরা যেতে চাই না; কারণ সেটা বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়। কিন্তু এই আন্দোলনের ফলে ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে যে সম্প্রীতির পরিবেশ আছে তা নষ্ট করতে চাইছে ভারতবিরোধী অশুভ শক্তিসমূহ; সেক্ষেত্রে ভারতবিরোধী চিনও আরো সক্রিয় হয়ে উঠবে বাংলাদেশে। এবং সেই সুযোগে এদেশের মোদী সরকার বিরোধী দলগুলো ঘোলাজলে মাছ ধরতে সচেষ্ট হবে। ইতিমধ্যেই পশ্চিমবঙ্গে সক্রিয় তৃণমূল।

প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশে ছাত্রদের লাগাতার সংরক্ষণবিরোধী আন্দোলন। রাস্তায় নামতে হল সেনাবাহিনীকে। ছাত্রদের দাবী ছিল, বাংলাদেশে সরকারী চাকুরীতে সংরক্ষণ বা 'কোটা ব্যবস্থার সংস্কার করতে হবে। আন্দোলন ক্রমে উত্তাল ও হিংসাত্মক আন্দোলনে পরিণত হয়। তাঁদের ডাকা এই 'কমপ্লিট শাটডাউনে' বাংলাদেশ কার্যত স্তব্ধ হয়ে পড়েছিল। পুলিশের সাথে আন্দোলনকারী ছাত্রদের সংঘর্ষে সরকারী হিসেব অনুযায়ী প্রাণ হারিয়েছে শতাধিক। রাজধানী ঢাকার রাস্তায় নামানো হয় সেনা-ট্যাঙ্ক, সাঁজোয়া গাড়ী। প্রায় দেড় দশক পরে

বেদনাহত শেখ হাসিনা

ঢাকার রাস্তায় মোতায়েন করতে হল সেনা ট্যাঙ্কের টহলদারি। রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন শহরে জারী হল কার্ফু। গোটা বিশ্বের সাথে বাংলাদেশের যোগাযোগ প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। শাসক আওয়ামী লীগ দলের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদেরের মতে, বিক্ষোভ দমন করতে স্থানীয় প্রশাসনকে সাহায্য করতে সেনাবাহিনী রাস্তায় নেমেছে। আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখতেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে, আন্দোলনরত ছাত্রদের মতে, এই আন্দোলন থামাবার প্রশ্নই নেই। আন্দোলন চলছে, চলবে। আমরা শেখ হাসিনার পদত্যাগ চাই ইত্যাদি।

এই প্রসঙ্গে বিস্তারিতভাবে আসার আগে বাংলাদেশের 'কোটা' বা সরকারী চাকুরীতে সংরক্ষণের বিষয়টি একটু বুঝে নেওয়া প্রয়োজন। বাংলাদেশে এতদিন সরকারী চাকুরীতে ৫৬ শতাংশ চাকুরী সংরক্ষিত ছিল আর বাকি ৪৪% শতাংশ চাকুরী নির্ধারিত ছিল সাধারণ চাকুরীপ্রার্থীদের জন্য। সংরক্ষিত ৫৬ শতাংশ চাকুরীর মধ্যে ১৯৭১-এর মুক্তিযোদ্ধাদের পরিবারের সদস্যদের পরিবারের সদস্যদের জন্য ৩০ শতাংশ, মহিলাদের জন্য ১০ শতাংশ, বিভিন্ন জেলার জন্য ১০ শতাংশ , জনজাতিদের জন্য ৫ শতাংশ এবং বিশেষভাবে সক্ষমদের জন্য ১ শতাংশ আসন সংরক্ষিত ছিল। ২০১৮ সালে কোটা ব্যবস্থা সংস্কারের দাবীতে দেশজুড়ে আন্দোলন হয়। সেই সময় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শুধু জনজাতিদের জন্য ৫ শতাংশ এবং শারীরিকভাবে সক্ষমদের জন্য ১ শতাংশ সংরক্ষণের কথা ঘোষণা করেন। হাসিনা সরকারের এই ঘোষণার বিরুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সাত সদস্য ঐ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে মামলা দায়ের করে। সেই পরিপ্রেক্ষিতে হাইকোর্ট তাঁদের নির্দেশে জানায়, বাংলাদেশ সরকারের ওই নির্দেশ অবৈধ। ফলে চাকুরীক্ষেত্রে সংরক্ষণ আগের মতই ফিরে আসে। আর এরই প্রতিবাদে চলতি মাসে কিছু সাধারণ ছাত্র ও কিছু ধুরন্ধর রাজনৈতিক নেতা আন্দোলন শুরু করে দেয়। শুরু হয় ছাত্রদের এই আন্দোলন। যদিও, জানা যাচ্ছে, ছাত্রদের এই আন্দোলন মূলত

ঢাকার রাস্তায় সেনাবাহিনী

মুক্তিযোদ্ধাদের পরিবারদের জন্য সংরক্ষিত ৩০ শতাংশ কোটার বিরুদ্ধে।তাঁদের এই ৩০ শতাংশ সংরক্ষণ দেওয়ার সপক্ষে বলা হয়েছে, মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন দেশের সাধারণ মানুষ। কিন্তু দেশ স্বাধীন হবার পরে দেখা গেল, অন্যরা সব সুযোগসুবিধা লুটেপুটে খাচ্ছে, অথচ, যারা দেশ স্বাধীন করার যুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত, সেই মুক্তিযোদ্ধাদের পরিবারগুলির অবস্থা শোচনীয়। শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পরে তাই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, অন্যান্যদের সাথে মুক্তিযোদ্ধাদের পরিবারের সদস্যদেরও ৩০ শতাংশ সংরক্ষণ দেওয়া হবে সরকারী চাকুরীর ক্ষেত্রে। যদিও, গত ১৯ তারিখে ঢাকায় এক সর্বদলীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে ১৪ টি রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করে। ওই বৈঠক থেকে শান্তির বার্তা দেওয়া হয়।

আন্দোলনে স্তম্ভিত বাংলাদেশ

রাজধানী ঢাকা শহরে সব রকমের সভা-সমাবেশ, মিটিং-মিছিল, ইত্যাদি করা যাবে না বলে ঘোষণা করা হয়েছে। ইন্টারনেট পরিষেবা ও রেল চলাচলও অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ করা হয়েছে।অনির্দিষ্টকালের বন্ধ রাখা হয়েছে সমস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানও। বাংলাদেশে ছাত্রদের এই আন্দোলন চলে গিয়েছে জাতিয়তাবিরোধী, মৌলবাদী ছাত্রদের হাতে। আসলে ছাত্রদের এই আন্দোলনের পেছনে আছে বাংলাদেশের বর্তমান শাসক আওয়ামী ও তার নেত্রী শেখ হাসিনার সরকারে বিরুদ্ধবাদী বি এন পি সহ অন্যান্য মৌলবাদী শক্তি। আর এখানেই প্রতিবেশী দেশ হিসেবে ভারতের চিন্তার যথেষ্ট কারণ আছে। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ওয়াজেদ তাঁর প্রস্তাবিত স্পেন ও ব্রাজিল সফর বাতিল করেছেন- ঘটনার গুরুত্ব এতটাই। এদিকে বাংলাদেশের চলমান অশান্তি নিয়ে রাষ্ট্রসংঘ উদ্বেগ প্রকাশ করেছে।এই অবস্থায় অগ্নিতে ঘৃতাহুতির কাজ করেছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার একটি বেফাঁস মন্তব্য। চিন সফর শেষে দেশে ফিরে তিনি একটি সাংবাদিক সম্মেলনে এক বেফাঁস মন্তব্য করে বলে বসেন, ' এসব স্বাধীনতা বিরোধী রাজাকারদের নাতি-পুতিরা করছে।' ব্যস ! আর যায় কোথায় ! আসলে বাংলাদেশে 'রাজাকার' শব্দটি একটি ঘৃণিত শব্দ।কেউ রাজাকার হিসেবে চিহ্নিত হতে চায় না। বাংলাদেশে স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় সে দেশের রাজাকার বলে

চিহ্নিত উগ্র সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী পাকিস্তানের দোসর হিসেবে কাজ করেছে। তাঁরা স্বাধীনতাযোদ্ধা ও পাকিস্তানীদের সন্দেহভাজন মুক্তিযোদ্ধা, হিন্দু সম্প্রদায় এবং আওয়ামী লীগ কর্মীদের বাসস্থান, ব্যবসায় সংস্থা, হিন্দুদের মন্দিরাদি দেখিয়ে দিত এবং নিজেরাও যথারীতি হিন্দু হত্যা, খুন-জখম, নারীধর্ষণ, লুটপাট ইত্যাদিতে অংশ নিত। স্বাভাবিকভাবেই বাংলাদেশের মৌলবাদী, ভারতবিরোধী অংশ হাসিনার এই মন্তব্যে বিশেষভাবে ক্ষুব্ধ হয়েছে। আর এখানেই ভারতের চিন্তিত হওয়ার বিশেষ কারণ আছে। বাংলাদেশের ছাত্রদের এই মৌলবাদী অংশ এবং হাসিনা বিরোধী রাজনৈতিক গোষ্ঠী ছাত্রদের এই আন্দোলনকে কেন্দ্র করে বিশেষভাবে সক্রিয় হয়ে উঠেছে। এইসব গোষ্ঠী রাজপথে নেমে হাসিনা সরকারের বিরুদ্ধে স্লোগান দিচ্ছে, ' হাসিনা হুঁশিয়ার, আমরা সব রাজাকার', আমরা সব তালিবান/ বাংলা হবে আফগান' ইত্যাদি। সাধারণ ছাত্ররাও এখন স্লোগান দিচ্ছে, 'রাজাকার, রাজাকার/ আমরা সব রাজাকার', আন্দোলনকারী ছাত্ররা স্লোগান তুলেছে, 'তুমি কে, আমি কে, রাজাকার, রাজাকার; কে বলেছে, কে বলেছে ? স্বৈরাচার, স্বৈরাচার" ইত্যাদি । দেখা যাচ্ছে, ছাত্রদের এই আন্দোলন আর সংরক্ষণ বিরোধিতায় থেমে নেই, এই আন্দোলন এখন হাসিনা সরকার বিরোধিতার রূপ নিয়েছে।হাসিনা সরকারের মন্ত্রী ও বিভিন্ন কর্মকর্তাদের মতে, 'শিক্ষার্থীদের এই আন্দোলন মুক্তিযুদ্ধের চেতনা নষ্ট করে দিচ্ছে'।

বাংলাদেশে মুক্তিযোদ্ধাদের পরিবারের জন্য সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা আছে কি নেই সেই বিতর্কে আমরা যেতে চাই না; কারণ সেটা বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়। কিন্তু আমাদের চিন্তার বিষয় হল, তাঁদের এই আন্দোলন এখন ভারত বিরোধিতার রূপ নিয়েছে। স্লোগান উঠেছে, ' ভারত যাঁদের মামাবাড়ি/ বাংলা ছাড়ো তাড়াতাড়ি' ইত্যাদি। এই আন্দোলন রূপ নিয়েছে বাংলাদেশের হিন্দুদের বিরুদ্ধেও। বিভিন্ন কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে হিন্দু ছাত্রদের ভয় দেখানো হচ্ছে, ছাত্রাবাস থেকে তাঁদের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ফেলে দেওয়া হচ্ছে।এমনকি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়য়ের মত পুরনো ও প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দু হস্টেলগুলি থেকেও হিন্দু ছাত্রদের সব জিনিসপত্র ফেলে দেওয়া হচ্ছে। অতীতেও লক্ষ করা গেছে, বাংলাদেশে যে কোন আন্দোলনই শেষ বিচারে হিন্দু ও ভারতবিরোধী আন্দোলনে পরিণত হয়। বর্তমান 'কোটা' বিরোধী আন্দোলনও শেষ অবধি হিন্দু ও ভারতবিরোধী আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই ভারতের পক্ষে বিশেষ উদ্বেগের কারণ রয়েছে। বেশ কয়েক বৎসর আগের মিশরে হোসনি মুবারকের বিরুদ্ধে ' মুসলিম ব্রাদারহুড' নাম দিয়ে যে আন্দোলন শুরু হয়েছিল তাও শেষ অবধি ইসলামী মৌলবাদী আন্দোলনে পরিণত হয়েছিল এবং তাঁদের মূল লক্ষ হয়ে দাঁড়ায় দেশকে গোঁড়া, মৌলবাদী পথে নিয়ে যাওয়া। বাংলাদেশের বর্তমান কোটা সংস্কার আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি দেখেও সেই সম্ভাবনার কথা মনে হচ্ছে। সরকার বিরোধী বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বি এন পি), বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী, জাতীয় পার্টি, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ), হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ এবং ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ ইত্যাদি হাসিনা সরকার বিরোধী দলগুলি ছাত্রদের এই আন্দোলন সমর্থন করছে। বিরোধীরা ছাত্র আন্দোলনের এই সুযোগে হাসিনার সরকারকে ব্যতিব্যস্ত করতে চাইছে; এবং সঙ্গে সঙ্গে ভারতবিরোধী স্বর চড়াতে চাইছে। এর ফলে সমগ্র উপ-মহাদেশসহ দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় এক অস্থির অবস্থার সৃষ্টি করে ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে যে সম্প্রীতির পরিবেশ আছে তা নষ্ট করতে চাইছে ভারতবিরোধী অশুভ শক্তিসমূহ; সেক্ষেত্রে ভারতবিরোধী চিনও আরো সক্রিয় হয়ে উঠবে বাংলাদেশে। এঁরা চাইছে, ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী ব্যাহত হলে সেদেশ থেকে আবারও ব্যাপক উদ্বাস্তু ও অনুপ্রবেশ শুরু হবে এবং সেই সুযোগে এদেশের মোদী সরকারবিরোধী দলগুলো ঘোলাজলে মাছ ধরতে সচেষ্ট হবে।

দেশবাসীর উদ্দেশ্যে হাসিনা বার্তা

ইতিমধ্যেই পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করে দিয়েছেন, বাংলাদেশে এই অচলাবস্থার কারণে কেউ যদি সেখান থেকে পশ্চিমবঙ্গে আসতে চান , তাহলে তাঁকে সাদরে আশ্রয় দেওয়া হবে। শ্রীমতী বন্দ্যোপাধ্যায় বোধহয় ভারতের সংবিধান আদৌ পড়ে দেখার প্রয়োজন বোধ করেননি; তিনি জানেনই না যে, ভারতের সংবিধান কোন অঙ্গরাজ্যকে বিদেশী নাগরিক সংক্রান্ত কোন অধিকারই দেয়নি। এই বিষয়ে কোন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কোন এক্তিয়ারই নেই।

বোঝা গেল না, তিনি হঠাৎ এই অনধিকার চর্চা কেন করলেন ? তিনি কি আবারও রোহিঙ্গা ও অন্যান্য মুসলিম নাগরিকদের ডেকে এনে, নাগরিকত্ব দিয়ে পশ্চিমবঙ্গকে পশ্চিম বাংলাদেশে রূপান্তরিত করতে চান ? তর আর সইছে না ! আর তিনি বোধহয় রাষ্ট্রসঙ্ঘের উদ্বাস্তু-সংক্রান্ত সনদও পড়ে দেখেননি। সেখানে কোন দেশের অনুপ্রবেশকারীদের কোন নাগরিক সুবিধা দেবার কথা বলা হয়নি, পরন্তু বিরোধিতা করা হয়েছে।এই অবস্থায় ভারত সরকার দৃঢ় অবস্থান নেবেন বলে আশা করা যায়। মমতা বাড়ুজ্জ্যে এবং তাঁর সভাসদদের মনে রাখা উচিত, মোদীর দলের আসন কমলেও, শ্রীমোদীই এখনও নিয়ামক; প্রয়োজনে শক্তহাতেই তিনি অবস্থার মোকাবিলা করবেন। অতএব.....

ফেক নিউজ

পরীক্ষায় না বসেই আইএএস অঞ্জলি বিড়লা! ১

লোকসভা নির্বাচনের পর শেষ দেড় মাসে সব থেকে বেশি ভুয়ো খবর যাঁকে নিয়ে হয়েছে তিনি অঞ্জলি বিড়লা, স্পিকার ওম বিড়লার মেয়ে। মাননীয় ওম বিড়লা গণতান্ত্রিকভাবে স্পিকার নির্বাচিত হওয়ার পরেই গোটা দেশ জুড়ে ছড়িয়ে দেওয়া হল তাঁর মেয়ে নাকি ইউপিএসসি পরীক্ষায় না বসেই আইএএস হয়ে গেছেন। বলা হলো তিনি নাকি আদতে মডেল এবং কোনও রকম ডিগ্রি তার কাছে নেই। বলাবাহুল্য অন্যবারের মতো এবারও এই ফেক নিউজ ছড়ানোয় নেতৃত্ব দেয় ধ্রুব রাঠীর মত কংগ্রেসের পুষে রাখা কিছু ইউটিউবার।

আসল খবর

ফেক নিউজ ছড়িয়ে পড়ার পরপরই অঞ্জলি দেবী নিজের ডিগ্রী সমেত ইউপিএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া সংক্রান্ত সমস্ত বিস্তারিত তথ্য সোশ্যাল মিডিয়ায় দেন। এমনকি ইউপিএসসির ওয়েবসাইটেও ২০২০ পাশ করা পরীক্ষার্থীদের যে তালিকা আছে সেখানেও অঞ্জলিদেবীর নাম আছে। আদালতের রায়ে গুগল এবং এক্স হ্যান্ডেল তাদের সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম থেকে এই সংক্রান্ত সমস্ত ফেক নিউজ সরিয়ে নেয়। কংগ্রেস এবং তার দালালেরা প্রকাশ্যে ক্ষমা চাইতে বাধ্য হয়। এবং শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত ফেক নিউজ ছড়ানো অনেকের বিরুদ্ধে আদালতে মামলাও হয়েছে।

কংগ্রেসের ফেক সংগঠন! ২

আরএসএস-এর চিঠি আসছে বিজেপিকে ভোট না দেওয়ার জন্য। অনেক সাধারণ মানুষ এতে বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের রাষ্ট্রবাদী নীতিতে যাঁরা ভরসা করেন তাঁদের অনেকে এটাকে সত্যি ভেবে বিপথে চালিতও হতে থাকেন। পরিস্থিতি এতটাই ঘোলাটে হয়ে যায় যে বিজেপির সাধারণ সম্পাদক অরুণ সিংকে সদলবলে নালিশ জানাতে হয় নির্বাচন কমিশনের কাছে।

আসল খবর

কংগ্রেস সেবা দলের সদস্যরা 'আরএসএস' নামে এক 'ফেক' সংগঠন খুলেছিল। তারপর আরএসএস লেটারহেডে চিঠি এবং বার্তা টাইপ করে বাড়িতে বাড়িতে বিলি করতে থাকে এই বলে যাতে তারা লোকসভায় কেউ বিজেপিকে ভোট না দেয়।

আরবাজ নিয়ে বাম মিডিয়ার ঢপবাজি ৩

জুলাই মাসের সাত তারিখে উত্তর প্রদেশ সমেত দেশের একটা বড় অংশে মিডিয়া খবর করে যে আরবাজ নামের এক সংখ্যালঘু যুবককে নাকি ধর্মের কারণে মারধর করা হয়েছে। যেহেতু রাজ্যটির নাম উত্তরপ্রদেশ তাই বাম সহ কংগ্রেস-তৃণমূলের তরফ থেকে প্রতিক্রিয়া জানাতে দেরি করা হয়নি। সবাই মুখ্যমন্ত্রী যোগীকে তুলোধোনা করে আবারো সংখ্যালঘু বিদ্বেষী হিসেবে দাগিয়ে দেয় বিজেপিকে।

আসল খবর

পরে অবশ্য জানা যায় ওই যুবক আরবাজ একটি হিন্দু নাবালিকা মেয়েকে নানাভাবে অত্যাচার এবং উত্তপ্ত করে তাকে ধর্ম পরিবর্তনে চাপ দিচ্ছিল। ওই যুবক আগেও অনেকের সাথে এমন করেছে বলে অভিযোগ। এ যাত্রায় হাতেনাতে ধরার পর এলাকার মানুষ তাকে বেঁধে রেখে পুলিশে খবর দেয়। পুলিশ এসে অভিযুক্ত আরবাজকে হেফাজতে নেয় এবং বিচারপ্রক্রিয়া শুরু করে। স্বাভাবিকভাবেই ধর্মের দোহাই দিয়ে অপরাধীকে অপরাধের শিকার হিসাবে তুলে ধরার বাম কংগ্রেসি ঘৃণ্য প্রচেষ্টা আবার ব্যর্থ হয়।

গুজরাট নিয়ে কংগ্রেসের ফেক ভিডিও ৪

গুজরাটের সেই ভিডিও নিশ্চয়ই অনেকেই দেখেছেন যেখানে দেখা যাচ্ছে একটা হোটেলে ইন্টারভিউয়ের জন্য উপস্থিত অনেকেই রেলিং ভেঙে নিচে পড়ে যাচ্ছেন। কংগ্রেসের সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেল থেকে এই ভিডিও পোস্ট করে বলা হয় নরেন্দ্র মোদির গুজরাটে নাকি এতটাই বেকারত্ব যে শিক্ষিত লোকজন একটা সামান্য চাকরির জন্য নিজের জীবনের ঝুঁকি নিতে চলেছে। ঝড়ের মতো ছড়িয়ে পড়ে এই

ভিডিও। ভারতের প্রায় প্রতিটি প্রথম সারির মিডিয়া খবরও করে। তারপর সামনে আসে প্রকৃত সত্য।

আসল খবর

হ্যাঁ ভিডিওটি সত্য। কোম্পানি তাদের বিজ্ঞাপনে জানিয়েছিল এই ইন্টারভিউ শুধুমাত্র অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য। স্বাভাবিকভাবেই যেহেতু অভিজ্ঞদের জন্য এই চাকরি তাই বেতনক্রম ছিল যথেষ্ট বেশি। অস্থিরতা ছড়াতে কংগ্রেস গোপনে প্রচার করতে থাকে সবাই এই লোভনীয় চাকরির ইন্টারভিউয়ে বসতে পারে। স্বাভাবিকভাবেই অনেক ফ্রেশার এবং অন্য পেশার লোক ইন্টারভিউ দিতে আসে। কিন্তু যেহেতু ইন্টারভিউ তাদের জন্য ছিলই না তাই তাদেরকে মূল দরজার বাইরেই আটকে দেয় সিকিউরিটি। সাময়িকভাবে একটা অস্থির পরিস্থিতির তৈরি হয় সেখানেই। আর সেই অস্থিরতার ভিডিও করে ফেক নিউজ ছড়িয়ে দেয় কংগ্রেস।

বি এস এন এল নিয়ে কংগ্রেসের ঢপ ৫

কংগ্রেসের সর্বভারতীয় মুখপাত্র তথা যুব কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সম্পাদক রোশনি জয়সওয়াল সম্প্রতি এক্স হ্যান্ডেলসহ বিভিন্ন সোশ্যাল

মিডিয়ায় পোস্ট করে দাবি করেন ইউপিএ আমলে নাকি বিএসএনএল লাভে চলত! তার দাবি ২০১৩ সালে বিএসএনএল ১০ হাজার কোটি টাকারও বেশি লাভ করে। তিনি আরো দাবি করেন কংগ্রেস ক্ষমতা থেকে চলে যাওয়ার পর নাকি বিএসএনএল লস করতে আরম্ভ করে।

আসল খবর

বাস্তব সত্য হলো শুধুমাত্র টেলিকম ব্যবসায় বিএসএনএল ২০১৩ সালে ১৫ হাজার কোটি টাকারও বেশি লস করে। এবং শুধু কংগ্রেসের জন্য বিএসএনএল প্রায় একটা লুপ্তপ্রায় কোম্পানিতে পরিণত হতে বসেছিল। সাম্প্রতিকতম বাজেটে অর্থমন্ত্রী ভারত সঞ্চার নিগম লিমিটেড সহ বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় টেলিকম সংস্থার জন্য প্রায় এক লক্ষ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছেন যা এই লুপ্তপ্রায় সরকারি কোম্পানিগুলোর পুনরুদ্ধারে ব্যবহার করা হবে।

রাহুলের খোয়াবনামা ৬

গত সপ্তাহে আমেরিকার রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের লড়াই থেকে সরে দাঁড়ান জো বাইডেন এবং তাঁর পরিবর্তে ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রতিপক্ষ হিসেবে উঠে আসেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত কমলা হ্যারিস। এই ঘটনা জানাজানি হয় দুপুরের দিকে আর তার ঠিক পরে সন্ধ্যেবেলা কংগ্রেসের আইটি সেল সোশ্যাল মিডিয়া সমেত সব জায়গায় এটা প্রচার করতে থাকে যে বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী নাকি ফোন করে অনেকক্ষণ কথা বলেছেন কমলা হ্যারিসের সঙ্গে।

আসল খবর

কয়েক ঘন্টা পর কমলা হ্যারিসের দপ্তর অবশ্য জানিয়েই দেয় এরকম কোন কথোপকথন হয়নি। আসলে রাহুল গান্ধীকে নেতৃত্বের মুখ হিসাবে তুলে ধরার অপচেষ্টা ছাড়া এটা কিছুই না। অতীতে বহুবার রাহুল গান্ধী বিদেশে গিয়ে ভারতের বদনাম করেছেন। তাঁর গ্রহণযোগ্যতা তলানিতে। এই অবস্থায় ফেক নিউজ ছড়িয়ে কংগ্রেস চেষ্টা করছে কিছুটা মুখরক্ষার।

অস্ট্রিয়ার ভিয়েনায় প্রবাসী ভারতীয়দের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

যে সমস্ত সাংসদ প্রথমবার মন্ত্রিসভায় প্রতিমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন তাদের সঙ্গে বিশেষ বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

পশ্চিমবঙ্গের সামগ্রিক পরিস্থিতি নিয়ে, দিল্লিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে বৈঠকে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

বার্বাডোজে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ২০২৪ জয়ের পর বিজয়ী ভারতীয় ক্রিকেট দলের সঙ্গে বাসভবনে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী।

ভারতীয় জনতা পার্টি পশ্চিমবঙ্গ শাখার পক্ষে জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক টী.সি. দত্ত মার্চেন্টস প্রা.লি., কলকাতা - ৭০০ ০২৫ হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।